# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩ - ৯ নভেম্বর ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা


## সিঙ্গুরের সংগ্রামী চাষীদের পাশে দাঁড়ান

### রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধের ডাক

কৃষিজমি রক্ষার মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত সিঙ্গুরের কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে এবং কৃষকের জমি কেড়ে নেবার সরকারি চক্রান্ত প্রতিরোধের সংগ্রামে সামিল হতে ৩ নভেম্বর 'সিঙ্গুর চলো' ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই।

সিঙ্গুরে কয়েক হাজার চাষীকে পুলিশ দিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে, গোটা এলাকা পুলিশ ও র‍্যাফ দিয়ে অবরুদ্ধ করে, অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে জবরদস্তি অতি উর্বর তিন হাজার বিঘা ৩/৪ ফসলি জমি টাটা কোম্পানিকে উপহার দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সিপিএম সরকার। এর বিরুদ্ধে সিঙ্গুরের চাষীরা গত ৫ মাস ধরে যে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তা এদেশের গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। এই সংগ্রামে অসংখ্য কৃষক আহত হয়েছেন, শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন রাজকুমার ভুল নামে এক তরুণ। চাষীদের জমি দিতে বাধ্য করার জন্য সরকার পুলিশ ও ক্রিমিনাল দিয়ে এমনকী চাষের গভীর নলকূপগুলো পর্যন্ত ভেঙে দিচ্ছে। তবু সিঙ্গুর মাথা নত করছে না।

৯ অক্টোবর রাজ্যের জনগণ সিঙ্গুরের কৃষক সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানিয়ে সাধারণ ধর্মঘট

*সাতের পাতায় দেখুন*

*২৭ অক্টোবর সিঙ্গুরে জনগুনানিতে বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল, পাশে মঞ্চে মেধা পাটেকর ও অন্যান্যরা। নীচে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।*

**কিট কেলেঙ্কারি**

## সরকারি প্রশ্রয়েই চলেছে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

মেডিকেল কিট কেলেঙ্কারির ভয়াবহ ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর স্তম্ভিত রাজ্যের মানুষ। সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তর সমস্ত কিছু জেনেশুনে যেভাবে মাসের পর মাস মানুষের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা চলতে দিয়েছে তা যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, তেমনই এই ঘটনায় জনস্বাস্থ্য বিষয়ে রাজ্য সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেল সেটাও ভয়াবহ।

পুলিশি তদন্তে দেখা গেছে, মনোজাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা মানুষের রক্তে এইচ আই ভি, হেপাটাইটিস বি ও সি এবং ম্যালেরিয়ার মতো মারণ রোগের জীবাণু সনাক্ত করার যে সরঞ্জাম বা 'কিট' দীর্ঘদিন ধরে বিপুল সংখ্যায় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে সরবরাহ করে আসছিল সেগুলি ব্যবহার করার মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ তা আর ব্যবহারযোগ্য নয়। গত এক বছর ধরে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এই মেয়াদ উত্তীর্ণ কিটগুলিই রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল এবং ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে সরবরাহ করে আসছে। কোন রোগীর শরীরে রক্ত দেওয়ার আগে দাতার রক্তে হেপাটাইটিস বি অথবা এইচ আই ভি-র জীবাণু আছে কি না, এই মেডিসিন সরঞ্জাম তথা কিট দিয়েই তা পরীক্ষা করা হয়। তদন্তে জানা গেছে, এ বছর সংস্থাটি হেপাটাইটিস বি-র ৯০ হাজার এবং হেপাটাইটিস সি-র ৫০ হাজার কিট স্বাস্থ্য দপ্তরকে সরবরাহ করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সেগুলি সরকারি হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাঙ্ক মিলিয়ে মোট ১১৫টি জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এই জাল কিট ব্যবহারের ফলে ইতিমধ্যেই কতজনের দেহে মারণরোগ এইচ আই ভি, হেপাটাইটিস বি ও সি-র জীবাণু প্রবেশ করেছে, তার কোনও হিসাব পাওয়াই যাবে না।

বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি থেকে এই 'কিট' নিয়ে অভিযোগ আসতে শুরু করেছিল। ২০০৫ সালে মনোজাইমের ম্যালেরিয়া যাচাই করার কিট সরবরাহের টেন্ডার বাতিল করে দিয়েছিল অসম সরকার। গত বছর ডিসেম্বরে এই কিট নিতে অস্বীকার করেছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল এইডস্ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটি। এন

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

### ভেজাল 'কিট' সরবরাহে যুক্তদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে

**এস ইউ সি আই**

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন — ''স্বাস্থ্য দপ্তরের চরম দুর্নীতির ফলে ভেজাল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ 'কিট' হাসপাতালগুলোতে ব্যবহার করানোয় এ রাজ্যের কয়েক হাজার মানুষ মারণ রোগ এইচ আই ভি, হেপাটাইটিস বি ও সি-র দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন মারাও গেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের বিষয় যে, কোন নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য দপ্তরের কেউ এ ঘটনায় জড়িত নয় বলে ঘোষণা করেছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এতগুলি মানুষকে যারা মারণ রোগের দিকে ঠেলে দিল তাদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি।''

## বিদ্যুৎ ভবনের সামনে হাজার হাজার বিদ্যুৎগ্রাহকের বিক্ষোভ

গত বছর, ২০০৫ সালের ২৭ অক্টোবর বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল বিশেষত কৃষিবিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবি জানাতে এলে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে গ্রাহকদের উপর লাঠি গ্যাস ও গুলি চালানো হয়েছে। সেই পুলিশি বর্বরতার স্মরণে এবছর ২৭ অক্টোবর একই জায়গায়, সল্টলেকের রাজ্য বিদ্যুৎ ভবনের সামনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কয়েক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক কালা দিবস পালন করল।

এই কালা দিবসের কর্মসূচি নিয়ে এদিন সকাল থেকে বিদ্যুৎ ভবনে এবং পুলিশের মধ্যে ছিল টান টান উত্তেজনা। সকাল থেকেই বিরাট পুলিশ বাহিনী, মহিলা পুলিশ, র‍্যাফ দিয়ে বিদ্যুৎ ভবনকে ঘিরে রাখা হয়েছিল। ভবনের ভিতরে এমনকী পর্ষদের চেয়ারম্যানের ঘরের সামনেও ব্যাপক পুলিশের সমাবেশ করা হয়েছিল। বিরাট বিদ্যুৎ ভবনের সমস্ত গেট ছিল সারাদিন বন্ধ। বেলা ১টা থেকে কালো ব্যাজ ধারণ করে কালো পতাকা নিয়ে বিভিন্ন জেলার গ্রাহকেরা আসতে থাকে। বেলা ২টায় শুরু হয় মিছিল। এরপর প্রতিবাদ সভা। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সমাবেশে বিদ্যুৎ ভবনের সামনের রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, অত্যাচার শেষ কথা নয় তা প্রমাণ করেছে বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলন। আন্দোলনের চাপেই গত বছর মুখ্যমন্ত্রী কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ বছর সেই ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

*সাতের পাতায় দেখুন*

*২৭ অক্টোবর বিদ্যুৎভবনের সামনে জমায়েতের একাংশ*

# পঞ্চায়েতীরাজ পরিণত হয়েছে ঠিকাদাররাজে

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে কার্যত চূড়ান্ত দুর্নীতি ও জালিয়াতির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এরাজ্যে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের ঘটনা সাম্প্রতিক সিএজি রিপোর্টে ধরা পড়েছে। বিভিন্ন খাতে যতটুকু টাকা বরাদ্দ হচ্ছে তার সিংহভাগই চলে যাচ্ছে দুর্নীতিতে। জনকল্যাণে খরচ হচ্ছে নামমাত্র। 'পঞ্চায়েতী রাজ' বাস্তবে ঠিকাদার রাজে পরিণত হয়েছে। সিএজি রিপোর্ট দেখিয়েছে, অন্তত ৪০ কোটি টাকা এদিকওদিক হয়ে গেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ ঠিকাদারদের খাতিরে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। মালদহ জেলা পরিষদ ঠিকাদার নিয়োগ করতেই ৪৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বেআইনিভাবে খরচ করেছে। হুগলি জেলাপরিষদ পিচ কিনতে গিয়ে ৬০ লক্ষ টাকা লোকসান করেছে। সেই টাকা পাওয়া গিয়েছে ঠিকাদারের 'মানিব্যাগে'। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের ১৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের ৭৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা গায়েব হয়ে গেছে। এগজামিনার অব লোকাল অ্যাকাউন্টস বা ই এল এ বলছে, অধিকাংশ গ্রামপঞ্চায়েতের হিসাবপত্র রাখার কোন ব্যবস্থাই নেই। ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে অডিট করার কোন কাগজপত্রই পাওয়া যায়নি। ২০০৩-০৪ সালে ৯২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোন বাজেট ছাড়াই টাকা খরচ হয়েছে। টাকার অভাবের কথা বলে রাজ্য সরকার যখন সমস্যাজর্জরিত গ্রামের মানুষের উপর যথেচ্ছভাবে ট্যাক্স চাপিয়ে চলেছে তখন সরকারি টাকার এই মোচ্ছব বন্ধ করার কোন উদ্যোগই তাদের নেই। উপরন্তু এস ইউ সি আই পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলি কর চাপাতে অস্বীকার করায়, তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে সরকার হুমকি দিচ্ছে। ১৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত কর, খাজনা, লিজ ইত্যাদি থেকে যে টাকা তুলেছে তা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়নি। ওই গ্রামপঞ্চায়েতগুলি কত টাকা তুলেছে, তার সঠিক হিসাব নেই। ৯৬টি গ্রামপঞ্চায়েতের সন্ধান মিলেছে যেখানে ক্যাশবুকের সঙ্গে ব্যাঙ্ক লেনদেনের বিস্তর ফারাক রয়েছে। সিএজি রিপোর্ট থেকে সহজেই বলা যায়, গ্রামপঞ্চায়েতগুলি জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি তহবিল তছরূপের, কিছু করে খাওয়ার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর পাওয়ার অধিকারী কেবল বিপিএল তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরাই। ইএলএ'র অডিট রিপোর্ট দেখিয়েছে, রাজ্যের ৩,৩৫৪টি গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে ১৩৪৮টি গ্রামপঞ্চায়েতে যাদের এই প্রকল্পে ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের কারোর নাম বিপিএল তালিকায় নেই। অর্থাৎ যে গরিব মানুষদের ঘরের টাকা পাওয়ার কথা, তাদের না দিয়ে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে অন্যদের। টাকা তছরূপের এই সুযোগই গ্রামে একদল নতুন কায়েমী স্বার্থবাজ গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। ঠিকাদার ও এই কায়েমীগোষ্ঠীর জোটবন্ধনে তৈরি হয়েছে এক নব্য ধনীকুল, যারাই এখন গ্রামবাংলায় শাসকদলের কর্তা, নয়া শোষক। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এটাই অবদান।

# জীবন নিয়ে ছিনিমিনি

*একের পাতার পর*

আর এস, আর জি কর হাসপাতাল এবং সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-এর পক্ষ থেকেও বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই এই কিট নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসারদেরও বিষয়টি জানানো হয়। এত অভিযোগ এবং এই জাল কিট ব্যবহারের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহে সংক্রমণ এবং প্রাণহানির আশঙ্কা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য দপ্তর কোন ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেয়নি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এমন একটি মারাত্মক কাণ্ড রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের জ্ঞাতসারে এতদিন ধরে চলতে পারল কী করে? তবে কি স্বাস্থ্য দপ্তরের রাঘব বোয়ালরা এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে? এই সম্ভাবনাই ধীরে ধীরে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উঠে আসছে বহু অফিসারের নাম। এজন্যই কি স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করা হয়নি? তবুও ঘটনা ফাঁস হয়ে গেল ঐ জালিয়াত সংস্থার কর্তাদের মধ্যে বিরোধের ফলে। এ না হলে হয়তো জানাই যেত না। এরকম একটি পরিস্থিতিতে, বিষয়টির সাথে যখন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-মরণ জড়িয়ে রয়েছে এবং কেলেঙ্কারির ব্যাপকতায় মানুষ আতঙ্কিত, তখন প্রয়োজন ছিল নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেওয়া। এর দ্বারা জনসাধারণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যেত। অথচ দেখা গেল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে যেন তেমন কিছুই হয়নি এরকম একটা নির্বিকার ভাব দেখিয়ে দোষীদের একাংশকে আড়াল করতে উদ্যোগী হলেন। যতটুকু তদন্ত এখনও হয়েছে তাতেই দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনেক অফিসার এই কেলেঙ্কারির সাথে জড়িয়ে রয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী সোজা বলে দিলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের কেউ এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত নয়। একটি শিশুও বোঝে যে, স্বাস্থ্য দপ্তর জড়িত না থাকলে অপরাধীরা এত ব্যাপক আকারে সরকারি হাসপাতাল, ব্লাড ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন সংস্থায় তাদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিতে পারত না। মুখ্যমন্ত্রী সহ সিপিএম নেতারা যখন কথায় কথায় সংবেদনশীল ও স্বচ্ছ প্রশাসনের বড়াই করেন, তখন স্বাস্থ্য দপ্তরের রাঘব বোয়ালদের আড়াল করতে তাঁরা নেমে পড়েছেন কেন? মনোজাইম কোম্পানীর মালিক কুখ্যাত পাটের ব্যবসায়ী গোবিন্দ সারদা যে দীর্ঘদিন ধরে সিপিএমের তাবড় তাবড় নেতা-মন্ত্রীদের একান্ত ঘনিষ্ঠ তাও কোন গোপন বিষয় নয়। তা না হলে এত বড় জালিয়াতি এতকাল ধরে চলতে পারত কি? ফলে, কেলেঙ্কারির জাল যেখানে বহুদূর বিস্তৃত এবং বিষয়টা জনগণের জীবন-মরণের সঙ্গে যুক্ত, তখন সরকার শুধু পুলিশি তদন্তে এ ঘটনাকে সীমাবদ্ধ রাখছে কেন? কেন এ নিয়ে কোন পাবলিক এনকোয়ারি হবে না? কেন বিচারবিভাগীয় তদন্ত অথবা বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠিত হবে না? কেন নিরপেক্ষ তদন্তের মধ্য দিয়ে অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের কাঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে না?

২৭ অক্টোবর দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে তিনি বলেছেন, কিট কেলেঙ্কারির রহস্য উন্মোচনে সিবিআই তদন্ত চাই। যে মুখ্যমন্ত্রী আগের দিনও স্বাস্থ্যদপ্তরকে আড়াল করতে তৎপর হয়েছেন তাঁর মুখে সিবিআই তদন্তের কথা বিস্ময়কর বৈকি! কিন্তু এই বিস্ময় কেটে যাবে তাঁর দলের মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত (২৮-১০-০৬) প্রকৃত তথ্যটি পাঠ করলে। সেখান থেকে জানা যাবে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যেহেতু কিটচক্র ৭-৮টি রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাই সিবিআই তদন্ত চাই, তবে এ রাজ্যের ক্ষেত্রে এই তদন্ত রাজ্যের পুলিশই করবে।

সিবিআই তদন্ত চেয়ে বোধহয় তিনি কেলেঙ্কারির ব্যাপকতা এবং তাঁর উদ্বেগের গভীরতা বোঝাতে চেয়েছেন। তাহলে সিবিআই তদন্ত থেকে এ রাজ্য বাদ যাবে কেন? রাজ্যের পুলিশকে তিনি যদি এতই দক্ষ বলে মনে করেন তবে তাদেরই নাকের ডগায় এই ভয়ঙ্কর কারবার এতদিন ধরে চলতে এবং ফুলে ফেঁপে উঠতে পারল কী করে? নাকি অন্য রাজ্যের জড়িত থাকার কথা বলে এ রাজ্যে কেলেঙ্কারির গভীরতা ও গুরুত্বকে তিনি লঘু করতে চাইছেন এবং রাজ্যের মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। পাশাপাশি তদন্তের ভার রাজ্যের পুলিশকে দিয়ে তদন্তের নিয়ন্ত্রণও নিজেদের হাতে রাখতে চাইছেন, যাতে এই অপরাধের সাথে যুক্ত দাগী দলীয় নেতা-মন্ত্রীদের বাঁচাতে পারেন। কোনরকম রাখ-ঢাক নয়, সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। তবেই একমাত্র কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত সমস্ত অপরাধীদের ধরা সম্ভব হতে পারে, তাদের আড়াল করার অপচেষ্টাকেও ব্যর্থ করা যেতে পারে।

**পুরুলিয়া**

# হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির গণঅবস্থান

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিকে তুলে দিয়ে এবং জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতিকে স্বশাসিত ও সেল্ফ ফাইনান্সিং হিসাবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সরকার কার্যত সাধারণ মানুষদের চিকিৎসার দায়িত্ব অস্বীকার করছে। এর প্রতিবাদে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি পুরুলিয়া জেলার উদ্যোগে গত ১৭ অক্টোবর ডি এম দপ্তরে তিন শতাধিক মানুষ গণঅবস্থান করেন। অবস্থানে হুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক শতদল মাহাত বলেন, তিনি এই আন্দোলনকে সর্বতোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া বলেন, আজকের বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করতে হলে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষদের সংগঠিত লড়াই ছাড়া উপায় নেই। তিনি এলাকায় এলাকায় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কমিটির বিশিষ্ট সদস্যা প্রণতি ভট্টাচার্য সহ সীতারাম মাহাত, ডাঃ দীপক মাহাত, ডাঃ গৌতম কর সি এম ও এইচ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে জেলার ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালগুলির পুনর্গঠন, উপযুক্ত সংখ্যায় ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ করার দাবি জানান। সমগ্র কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন জেলার স্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতা ডাঃ ভাস্কর ভদ্র।

*বক্তব্য রাখছেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া*

# পিটিটিআই ছাত্রদের আন্দোলনের জয়

গত ১৭ অক্টোবর পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং থানার রেণুকা প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ইন্সটিটিউশন কর্তৃপক্ষের অন্যায় ভাবে ছাত্র পিছু ১০০০ টাকা নেওয়ার চক্রান্ত রুখে দিল প্রতিবাদী ছাত্ররা। ধারাবাহিক ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, আইন অমান্য এবং অবশেষে আমরণ অনশন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পিটিটিআই, বিএড এবং বিপিএড ছাত্রদের আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। গত ১১ সেপ্টেম্বর বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করে ট্রেনিং কলেজগুলির এনসিটিই'র স্বীকৃতির সময়সীমা ৬ মাস বাড়াতে বাধ্য হয়। কর্তৃপক্ষ এই সুযোগে বিভিন্ন ট্রেনিং কলেজগুলি, ছাত্রদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই যারা ৪০-৫০ হাজার বা তারও বেশি টাকা নিয়েছিল আবারও টাকা নেওয়ার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়, যার মধ্যে রেণুকা পিটিটিআই এর নাম উল্লেখযোগ্য। ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্টুডেন্টস ইউনিয়নের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা যুগ্ম সম্পাদক সমীর বেরা ও অশোক পালুই-এর নেতৃত্বে শতাধিক ছাত্রছাত্রী কলেজ কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে। এর আগেই ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১,০০০ টাকা চেয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের নামে কলেজের স্ট্যাম্প বাদ দিয়ে যে পোস্টকার্ড ছাত্রদের পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিলিপি ডি আই, চেয়ারম্যান ও মন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপে রেণুকা পিটিটিআই কর্তৃপক্ষ টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হন।

এছাড়াও বিপিএড এবং বিএড (ওয়ার্ক এডুকেশন) এর ছাত্ররা স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসবার জন্য পরীক্ষা পেছনোর যে দাবি করেছিলেন তা জয়যুক্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা পিছিয়ে ১০ ডিসেম্বর করতে। আন্দোলনের রাজ্য নেতৃত্ব আনন্দ হাণ্ডা, পিন্টু পারুই ও নিরঞ্জন রায় আগামী ১৩ নভেম্বর তাঁদের দাবিগুলির দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে কলেজ স্কোয়ারে একটি নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছেন।

# উত্তর কোরিয়ায় মার্কিন অবরোধের বিরুদ্ধে পাটনায় বিক্ষোভ

উত্তর কোরিয়ার উপর মার্কিন অবরোধের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই পাটনা জেলা কমিটির আহ্বানে একটি সুসজ্জিত মিছিল সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশ থেকে যাত্রা শুরু করে স্টেশন পর্যন্ত মার্চ করার পর জনসভায় পরিণত হয়।

জনসভায় এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড অরুণ কুমার সিং বলেন— বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত করে সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল দেশগুলিকে অস্ত্রহীন করার জন্য হুমকি দিচ্ছে। এর জবাবে নিজস্ব স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যই উত্তর কোরিয়া পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্ত উদঘাটন করে উত্তর কোরিয়ার সমর্থনে দাঁড়ানোর আহ্বান তিনি জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাটনা জেলা সম্পাদক কমরেড শিবলাল প্রসাদ।

# ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি কাদের স্বার্থে

*(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

### সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ববাদীদের ঐক্য

চীন-জাপান-ভারত সহ জাপান প্রস্তাবিত প্যান এশিয়ান ট্রেড ব্লক (এশীয় দেশ ও ৬টি অন্যান্য দেশ) এবং চীনের নেতৃত্বে চলতি ১৩টি দেশের ইস্ট এশিয়ান ফ্রি-ট্রেড জোন — এশিয়াতে এই চ্যালেঞ্জের কথাটা আমেরিকাকে হিসাবে রাখতেই হবে। [টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৫-০৮-২০০৬] তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো আছেই। ভারতেরও ''প্রভাবাধীন এলাকা বাড়ানোর'' প্রভুত্বকামী সাম্রাজ্যবাদী লালসা বড়ই নগ্ন। ২০০১-এ আমেরিকায় সফরের সময় বৈদেশিক মন্ত্রী যশবন্ত সিংহ এক সাক্ষাৎকারে বলছেন ঃ ''ভারতবর্ষের বিস্তার ঠিক কতখানি, দীর্ঘদিন তা অজ্ঞাতসারে থেকে গেছে। ক'জন জানেন যে, ভারতের দক্ষিণসীমার শেষপ্রান্ত থেকে ইন্দোনেশিয়ার দূরত্ব মাত্র ৬৫ মাইল, কিংবা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে হিসাবের মধ্যে নিলে তাজিকিস্তান মাত্র ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত, অথবা ১৯৪৭ সালে ইরান ছিল ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী দেশ। ক'জন জানেন যে, ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কুয়েতের সরকারি মুদ্রা ছিল 'রুপি'। তাই, আমরা যখন মধ্য এশিয়া কিংবা পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলি সম্পর্কে বলি, তখন নিজেদের স্বার্থে এগুলি নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চল ধরে নিয়েই বলি।'' [টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৩-০৪-২০০১] এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে বিবেক রঘুবংশীর 'ইন্ডিয়া টু প্রোটেক্ট পাওয়ার অ্যাক্রস এশিয়া' [ডিফেন্স নিউজ, ১০-১১-০৩] লেখাটিতে। কে না জানে, বাজপেয়ী সরকার ভারত মহাসাগর, পারস্য উপসাগর এবং গোটা এশিয়া জুড়ে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশে পরিণত করার ২০ বছরের এক কর্মসূচি নিয়েছিল [ঐ]।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ভারতের সামরিকীকরণ বিস্ময়কর। ভারতের সামরিক খাতে ব্যয় ১৯৯৮-৯৯ সালে ৪৯,০০০ কোটি টাকা (১১.৬ বিলিয়ন ডলার) থেকে ২০০১-০২ সালে হল ৬৮,০০০ কোটি টাকা (১৪.২ বিলিয়ন ডলার), আর ২০০৪-০৫ সালে ৯০,০০০ কোটি টাকা (২০ বিলিয়ন ডলার)। ২০০৬ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৭,০০০ কোটি টাকা (২১.৫ বিলিয়ন ডলার)। অর্থাৎ মাত্র ৬ বছরে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৪৮,০০০ কোটি টাকা। এই অর্থের অর্ধেকই ব্যয় হয় অস্ত্র আমদানি করতে। স্টকহোলম্ ইন্টারন্যাশানাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, গত ৬ বছরে অস্ত্র আমদানিতে খরচ হয়েছে ৯.৫ বিলিয়ন ডলার, যা দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ পরিমাণ, চীনের পরই যার স্থান। ২০০৩ সালে এই পরিমাণ ভারতের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হয়েছে। সুপার পাওয়ার হিসাবে প্রভাবাধীন এলাকা বৃদ্ধির লিপ্সা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী-সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সহায়তা সবচাইতে সুবিধাজনক হতে পারে। কারণ সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে সোভিয়েতের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর, আমেরিকাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় পুঁজি প্রাক-স্বাধীনতা পর্বেই একচেটিয়া স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজির অংশ হিসাবে তা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরুদ্ধে আপসকামী বিরুদ্ধবাদী ভূমিকা নিয়েছিল। ঘরের গণ্ডি ভাঙার প্রবণতাও সেই পরিস্থিতিতে যতটুকু সম্ভব ততটুকু অন্ততঃ ভ্রূণ আকারে বিকশিত হচ্ছিল। পুঁজিপতিশ্রেণীর সেই আকাঙ্ক্ষাই ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের নেতা জওহরলাল নেহেরুর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসে, ভারতবর্ষ তখনও ব্রিটিশের উপনিবেশ, সেনা অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণে নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, ''ভারতবর্ষ বর্তমানে বিশ্বের চারটি মহাশক্তিধর দেশের অন্যতম; অন্য তিনটি দেশ হল — আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন। কিন্তু সম্পদের দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতবর্ষ চীনের চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়।'' তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষই আধিপত্য বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক।'' (গ্রেট পাওয়ার ক্লায়েন্ট স্টেট নামক বইয়ে, নেহেরুর নির্বাচিত রচনাবলী থেকে উদ্ধৃত)।

ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণীর ওই ক্ষুধা খাপ খায় আমেরিকার নিজস্ব একাধিপত্যের তাগিদের সঙ্গে। তার নজির —

(১) এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে দূরত্ব অনেক। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের তুলনায় এখানে যাতায়াতের পথের পরিকাঠামো কম। অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রপথের ওপর যতটা নির্ভর করতে পারে, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় তা পারেনা। তাই ২০০১ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্বার্ষিক প্রতিরক্ষা পর্যালোচনায় অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা এবং পরিকাঠামো বিষয়ে চুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। (প্রতিরক্ষা বিভাগের ডেপুটি অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি পিটার ব্রুকস-এর ২০০২ সালে কংগ্রেসকে দেওয়া রিপোর্ট)।

(২) এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে থাকায় ভারতের অবস্থানগত সুবিধা, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সমুদ্রপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সেতুর মতো অবস্থান — ইত্যাদি সুবিধা থাকার কারণে মার্কিন সামরিক বিভাগের চোখে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিজের প্রয়োজনে এশিয়ায় একটি বিকল্প মিত্র দেশের সন্ধান করতে হচ্ছে। ভারতবর্ষই হল তার সবচেয়ে পছন্দসই দেশ।

যদি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরবের মত পুরানো বন্ধুরা বিগড়ে যায়, তেমন দুঃসময়ের জন্যও ভারতকে দরকার (আসপেক্টস অফ ইন্ডিয়া'স ইকনমি ২০০৪, ভল্যুম - ৪১, রিসার্চ ইউনিট ফর পলিটিক্যাল ইকনমি)।

আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ হলেও ভারত-জাপান যৌথ সুরক্ষা সামরিক চুক্তিটাও তো ফেলে দেওয়ার মত নয়।

ভারত ও আমেরিকার দুই তরফের এই প্রয়োজন ও লক্ষ্য পরস্পরকে কাছে ঠেলে দিচ্ছিল ক্রমাগত। তাই পরমাণু চুক্তির পূর্বসূরী হিসাবে এসেছে পারস্পরিক সামরিক চুক্তি এবং কৃষি, বিজ্ঞান ও উন্নত কারিগরী সংক্রান্ত একগুচ্ছ চুক্তি। অত্যন্ত শক্তিশালী পরিণত ভারতীয় পুঁজিবাদের আকাঙ্খা এ কারণেই প্রকাশিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর ভাষায় ঃ আমরা স্বাধীন শক্তি, মুৎসুদ্দি রাষ্ট্র নই; আমরা দয়াপ্রার্থী নই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উভয়ের স্বার্থই এক, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সমমর্যাদার ভিত্তিতে আমরা (ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) একসঙ্গে কাজ করব। (১৭ জুলাই,'০৫, ঐ)। দুই রাষ্ট্রের স্বার্থের এই মিলন নানা রূপে দেখা যাবে, দেখা যাচ্ছেও।

### একচেটিয়া পুঁজি জোটের স্বার্থেই চুক্তি

জাতীয় স্বার্থে পরমাণু চুক্তি হচ্ছে বলে বলা হয়েছে। ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী দেশ এবং এর শাসনক্ষমতায় রয়েছে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী। তারাই শাসক ও শোষক। অন্যদিকে শাসিত ও শোষিত শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও আপামর জনসাধারণ। স্বাভাবিকভাবে সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে, শাসকশ্রেণীর স্বার্থেই যাবতীয় নীতি এ দেশে পরিচালিত হয়। দুনিয়ার সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ ও জাতি এমনভাবেই শ্রেণীবিভক্ত। গণতন্ত্র কথাটার মানেই হচ্ছে শ্রেণী গণতন্ত্র। রাষ্ট্রের কাজ এই ক্ষমতাসীন শ্রেণীকেই সেবা করা। লগ্নী পুঁজির ও একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই পুঁজির স্বার্থকেই জনতার স্বার্থ বলে, দেশের স্বার্থ বলে চালানো হয়। বিপরীতে সমাজতন্ত্র হলো শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র। শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় থাকার দরুন — রাজনীতি-অর্থনীতি সহ সকল নীতিই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে রচিত হয়। তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনো বিচারই শ্রেণী-নিরপেক্ষ হতে পারে না। এই কারণে পরমাণু নীতি, বিদ্যুৎ নীতি, সমর নীতি, শক্তি নীতি, জাতীয় নীতি, বৈদেশিক নীতি — সমস্ত কিছুই একটি প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করে এবং তার ভিত্তিতে সমর্থন করে বা বিরোধিতা করে। ভারতের সাম্প্রতিক পরমাণু চুক্তিটাও হতে যাচ্ছে দু'টি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে। এই চুক্তি সম্পাদন করতে পুঁজি-অর্থনীতির উপরিকাঠামো হিসাবে সরকার ও রাষ্ট্র ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে কোনমতেই এর উদ্দেশ্য জনকল্যাণ নয় — ব্যবসা ও বাজারের লেনদেন।

পরমাণু চুক্তিটার মধ্যে মিশে আছে দুটো জিনিষ। একটা হলো এনার্জির ব্যবসা, আর একটা হলো বোমা তৈরির মসলার ও কারিগরীর ব্যবসা বা প্রযুক্তির ব্যবসা। প্রকাশ্যে প্রচার শান্তি ও প্রগতির জন্য এনার্জি ও প্রযুক্তির প্রাপ্তি ব্যবস্থা, অপ্রকাশ্যে উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ ব্যবসা, যুদ্ধ-অর্থনীতির পুষ্টি। এই প্রশ্নে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বন্দ্ব ও আপোষের ফলের পরিণাম হচ্ছে সাম্প্রতিক চুক্তি। কাদের স্বার্থে দেখা যাক।

সস্তায় বিদ্যুৎ, মানে সস্তায় উৎপাদন, মানে লাভ বেশি। শিল্প-কৃষি-পরিবহন সহ সমগ্র অর্থনীতির আধুনিক ভিত্তির মূলে থাকে বিদ্যুতায়ন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিদ্যুৎনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। একটা নজির দেখা যাক। ১৯২০ সালে অর্থনৈতিকভাবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ছিল খুবই পিছিয়ে-পড়া দেশ। মহান লেনিন সমগ্র অর্থনীতিকে আধুনিক করতে, শিল্প-কৃষিকে তুল্যমূল্য বৃহদায়তন করতে, পরিবহন সহ সব কিছুকে আধুনিক করতে, শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ১০ বছরের পরিকল্পনা নিলেন। সারা দেশের বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন করে বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা হল, যা রূপায়ন করতে তৈরি হল ৩৫৭ মিলিয়ন মানব দিবস। ১৯২০ সালে কমিনটার্নের দ্বিতীয় সম্মেলনে এবং মস্কো পার্টি সম্মেলনে লেনিন তাঁর বক্তব্যে সমাজতন্ত্রে জনকল্যাণে বিদ্যুৎ সম্পর্কে নীতির একটি প্রতীকী শিক্ষা তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, সমাজতন্ত্র হল বৈদ্যুতিক শক্তি ও সোভিয়েট শক্তির যোগফল। মস্কোর এক অজ গাঁয়ে বিদ্যুৎ আলো পৌঁছানোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লেনিন হাজির হলেন। আলো জ্বলার পর এক চাষী বক্তৃতায় বললো, ''আমরা কৃষকরা ছিলাম অনালোকিত, আর এখন আমাদের মাঝে আলো দেখা দিয়েছে — একটা অস্বাভাবিক আলো, যা আলোকিত করে তুলবে আমাদের কৃষক-তমসা''। ভারতবর্ষের মত পুঁজিবাদী দেশে এমন প্রয়োজনে বিদ্যুৎ নয়। এ হল লাভজনক পণ্য। আধুনিক বিদ্যুৎপ্রযুক্তি শ্রমিক-কৃষকের জীবনে আনে অন্ধকার, আলো নয়; আনে না কর্মনিযুক্তি, আনে বেকারীত্ব, ছাঁটাই, দারিদ্র, হাহাকার আর মৃত্যু। কৃষিক্ষেত্রের করুণ অবস্থা নিয়ে কে কে বিড়লাকেও লিখতে হয়েছে, ''৭০% কৃষিক্ষেত্রই আজও প্রকৃতি নির্ভর।'' কোথায় বিদ্যুৎ? পাঞ্জাব, হরিয়ানার মত দু'একটি রাজ্যে বিদ্যুৎ কৃষিক্ষেত্রে সস্তা — তা নিতান্তই বড় বড় জোতের ক্ষেত্রে মূলত কাজে লাগে। গরিব চাষী ছিটেফোঁটা তার যে সুযোগ পায় তাকে গরিব চাষীর পাকা রাস্তায় ধান শুকানোর মত উপরিসুবিধে হিসাবেই তুলনা করা চলে। এ রাজ্যেও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির দরুন মুষ্টিমেয় যেসব চাষী বিদ্যুৎচালিত পাম্পের সুবিধা পেত, তারাও মূল্যবৃদ্ধির দরুন বিদ্যুৎ সংযোগ ছেড়ে দিচ্ছে। কৃষিকে শিল্পের মত বৃহদায়তনাকারে আধুনিকীকরণ পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগে সম্ভব হয়েছিল। আজ পুঁজিবাদে সেই আধুনিকীকরণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই চাষী মরবে।

### পরমাণু বিদ্যুৎ নীতি — ২০০৩ বিদ্যুৎ আইন নীতির অংশ

প্রকৃতপক্ষে পরমাণু বিদ্যুৎ নীতি সামগ্রিক বিদ্যুৎনীতির, যা বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ নামে পরিচিত —তারই অংশ। এনার্জি সংক্রান্ত সমগ্র নীতি ও পরমাণু বিদ্যুৎশক্তি নীতিও আবার সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উদারীকরণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমর পরিকাঠামো ও সমর শিল্পও অর্থনীতির উদারীকরণের নীতির দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই এক্ষেত্রেও বেসরকারীকরণ হচ্ছে। তাই দেখা গেল, এই চুক্তি সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নেতাদের সফরের সময় আমেরিকায় আহুত ভোজ সভাটিতে উপস্থিত হলেন দুই দেশেরই একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর কর্তারা। ইতিপূর্বে ওয়াশিংটনে তৈরি হয়ে গেছে ইউএস-ইন্ডিয়া সি ই ও ফোরাম। উদ্দেশ্য দু-দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা। দু'পক্ষের একচেটিয়া গোষ্ঠীর কর্ণধারদের সভায় সভাপতি ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলুওয়ালিয়া। বিইএস গ্রুপ, কারগিল, সিটি গ্রুপ, জেপি মর্গান, চেস হনিওয়েল, ম্যাকগ্র হিল প্রভৃতির মত সংস্থার পাশে টাটা গ্রুপ, আইটিসি লিমিটেড, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, কন ইন্ডিয়া গ্রুপ, আইসিআইসিআই, ইনফোসিস প্রভৃতির পাণ্ডারা উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকান ঠিকাদারী সংস্থা, ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী সহ নানা কিছুর ১০০০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার সুযোগ সাম্প্রতিক চুক্তি উপলক্ষে সৃষ্টি হয়েছে। আশান্বিত হয়ে তাই আমেরিকার বৈদেশিক মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে বলেছে, ''গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলের মতবিনিময়ের জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষেত্রের একটি উচ্চ পর্যায়ের মঞ্চ তৈরির প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে উভয় দেশের সরকারই সহমত হয়েছে।'' (দি স্টেটসম্যান, ২৮-০৮-০৬)

মজার ব্যাপার হল, পরমাণু চুক্তিটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে তার জন্য আমেরিকার প্রভাবশালী আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের কব্জায় আনতে আধ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ। (ঐ)

ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকটি ভালভাবে তুলে ধরে আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লিখেছেন, ''ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি শুধু যে জেনারেল ইলেকট্রিক এবং ওয়েসটিং হাউসের মতো 'নিউক্লিয়ার ডেভেলপার'দের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ বলে গণ্য হতে পারে তাই নয়, এই চুক্তি ক্যারোলাইটের ডিউক এনার্জি এবং প্রোগ্রেস এনার্জির মতো 'নিউক্লিয়ার অপারেটর'দের কাছেও অত্যন্ত মূল্যবান হবে।'' (ঐ)

### পরমাণু বিদ্যুৎক্ষেত্রের উদারীকরণ চায় পুঁজিপতিশ্রেণী

এটা পরিষ্কার, এত কাণ্ডের মধ্যে জনতার কোন ঠাঁই নেই। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের অংশ হিসাবে ভারতীয় পুঁজিবাদ বিদ্যুৎক্ষেত্রে উদারীকরণ এনে আইন করেছে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩। উৎপাদন, বণ্টন, সঞ্চালনকে তিন ভাগে ভাগ করেছে। কমপক্ষে মালিকদের ১৬-৩১% লাভ সুনিশ্চিত

*চারের পাতায় দেখুন*

# ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে

*তিনের পাতার পর*

করেছে। এ রাজ্যেও তাই হচ্ছে। বিজেপি-চালিত এনডিএ সরকার প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ বিল-২০০১-এর খসড়া বামফ্রন্টের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া সহ অন্যদের নিয়ে গঠিত সংসদীয় কমিটিতে পরিণত রূপ পেয়ে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এ পর্যবসিত হয়ে লোকসভায় সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়েছে। উৎপাদন ভাগ হয়েছে ১) ক্যাপটিভ, ২) জলবিদ্যুৎ, ৩) তাপবিদ্যুৎ-এ। জল ও তাপবিদ্যুতে লাইসেন্স লাগে না। বৃহৎ গোষ্ঠী যারা ক্যাপটিভ তারাও নানা সুবিধার শর্তে নিজেরাই নিজেদের উৎপাদনের জন্য শত শত কোটি টাকা ঢেলে সস্তায় উৎপাদন করবে বিদ্যুৎ। ফলে তাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতাও তাতে বাড়বে।

কে কে বিড়লার লেখায় যে ধ্বনি ব্যক্ত হয়েছিল পরমাণু চুক্তি উপলক্ষে সে কথাই উঠল। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান সি এন রাও প্রস্তাব করেছেন ঃ (১) পরমাণু শক্তিক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রকে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত। কারণ এগুলি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প; এবং এগুলিতে শুরুতে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়, অবশ্য পরে এর ফলে সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। (২) দ্বিতীয় কারণ বলা হয়েছে, সরকারি সংস্থার একাধিক অপদার্থতা ও ঝুঁকি। ভারতবর্ষে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের দায়িত্ব ছিল যে সরকারি সংস্থাটির উপর সেই 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটিড' (এনপিসিআইএল) সংস্থাটি বিশেষ গৌরবের পরিচয় দিতে পারেনি। এই সংস্থাটির প্ল্যান্টগুলি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অদক্ষ বলে পরিগণিত। এগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও বহু প্রশ্ন উঠেছে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ৩১-০৮-০৬)।

বেসরকারীকরণের সপক্ষে সেই বস্তাপচা যুক্তিগুলি এক্ষেত্রে মুখস্থ বলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বেসরকারীকরণের দাবি উঠেছে। দাবি উঠেছে, প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রকে উদার করে দাও। (ঐ)

বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএম সকলের বোঝাপড়া ও বুদ্ধিতে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ তৈরি হয়েছে বলে পরমাণু বিদ্যুৎ নীতির এই সকল প্রশ্নে লোকসভায় গলাবাজি করলেও সকলেরই অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে পরমাণু চুক্তি।

সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সকলের জন্য শিক্ষার কর্মসূচির পরিণতি যা হয়েছে, গ্রাম বাংলার বিদ্যুৎ তেমনই হবে। বাজারে কাটতির জন্য এই বুলিটা দরকার। পরমাণু চুক্তির পূর্বসূরী হিসাবে এসেছে ঃ ১) ইন্ডিয়া-ইউ এস নলেজ ইনিশিয়েটিভ (কেআইএ)। উদ্দেশ্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ জোরদার করা — বিজ্ঞান, কারিগরী, কৃষি, শিক্ষা, গবেষণা, বাণিজ্যিক ক্ষমতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে। ২) ঐ সূত্র ধরেই এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হিসাবে ইন্দো-ইউ এস হাই টেকনোলজিকাল এগ্রিমেন্ট। ৩) ২০০৫ এর ২৯ জুন ইন্ডিয়া-ইউ এস মিলিটারি প্যাক্ট। দশ বছর মেয়াদি এই চুক্তিতে রয়েছে, যৌথ উদ্যোগে সামরিক উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যের আদানপ্রদান, সর্বত্র শান্তিরক্ষার জন্য যৌথভাবে সেনা প্রেরণ, বহুজাতিক সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ।

### বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের ভাগবাঁটোয়ারায় ছোট হিস্যাদার হওয়ার কৌশল ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের

এর ফলে রাজনীতি ও প্রতিরক্ষার মত ক্ষেত্রে মার্কিনী হস্তক্ষেপ বাড়বে, যা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে ক্রমশই হয়ে উঠছে বিপজ্জনক। পরমাণু চুক্তিটা পূর্বাপর এই চুক্তিগুলির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত একটা বিষয় এবং এগুলির যুক্তিসঙ্গত পরিণতি মাত্র।

সামরিক ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতের জোটবন্ধন ভারতকে আমেরিকার যুদ্ধ চক্রান্তের অংশীদারে পরিণত করছে। এর পেছনে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাজ করছে। আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী তার ব্যবসায়িক স্বার্থ পূরণের যেমন চেষ্টা করছে, তেমনি ভারতও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-কৃষি-শিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকাকে ঢুকতে দিচ্ছে। কারণ ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে দেশের বাজার বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারেরই অংশ। এর উদ্দেশ্য হল, দেশের বাজারে সুযোগ দিয়ে বিদেশের বাজারে সুযোগ নেওয়া। এটা করতে গিয়ে ভারত কখনো আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বে যাবে, যেমন গিয়েছিল পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে (এনপিটি ও সিটিবিটি) স্বাক্ষর না করে; তেমনি আবার আপসও করবে। এনপিটি এবং সিটিবিটিতে ভারত যে স্বাক্ষর করেনি এবং একটা আপাত লড়াকু ভূমিকা নিয়েছিল তার পিছনে ভারত রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা আদৌ ছিল না। এই সত্য গোপন করে সিপিএম-সিপিআই'র মতো তথাকথিত বামদলগুলি একে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা হিসাবে দেখিয়ে তারিফ করেছিল। ভারত কেন এই বিরোধিতার ভান করেছিল? এ ব্যাপারে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকায় তদানীন্তন বিদেশমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারটি স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, ''এটা চাপ দেওয়ারই একটা কৌশল।'' কেন এই চাপ দেওয়া? এই চাপ কীভাবেই বা কার্যকরী ফল দেবে? সেইসময়, কিছু সাম্রাজ্যবাদী দেশ পারমাণবিক অস্ত্র রাখতে পারবে, অন্যেরা পারবে না — এ নিয়ে যে বিরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী চাপের খবরদারিতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে যে বিক্ষোভ — তাকে কাজে লাগিয়ে লড়াকু ভাবমূর্তি গড়ে তোলা এবং তাদের নেতা হয়ে বিশ্ববাণিজ্যে দরকষাকষি করার ক্ষমতা বাড়ানোই ছিল এই চাপ দেওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। আজও ভারত এই দ্বন্দ্ববিরোধকে কাজে লাগিয়ে দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর নিত্যনতুন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলোর বাজার খুলে দেওয়ার জন্য যে চাপ সৃষ্টি করে — এর দ্বারা ভারত পাল্টা চাপ সৃষ্টি করে ওদের বাজারেও ঢুকতে পারে কি না — এটাই হল এইসব দ্বন্দ্বের আসল কথা। সেদিন এনপিটি এবং সিটিবিটি-তে স্বাক্ষর না করার যে উদ্দেশ্য ছিল, আজ পরমাণু চুক্তি সহ অন্যান্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়েছে সেই একই উদ্দেশ্যে।

পরমাণু চুক্তির মধ্যে দু'টো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য রয়েছে। এর প্রথমটি প্রকাশিত, আর দ্বিতীয়টি অপ্রকাশিত-লুক্কায়িত। অর্থাৎ প্রকাশ্যে শান্তির জন্য, উন্নয়নের জন্য শক্তি ও শক্তিপ্রযুক্তির চুক্তির কথা বলা হলেও গোপন উদ্দেশ্যটি হল বোমার মশলা জোগাড়। সুতরাং পরমাণু চুক্তি আসলে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের চুক্তি।

এই পরমাণু নীতিটি আবার সামরিক অর্থনীতি বা যুদ্ধব্যবসারও অঙ্গ। বাজারের ভাগাভাগি ও যুদ্ধব্যবসার অংশীদারিতে আমেরিকার দিকে পাল্লা ভারি, কারণ তারই পুঁজির জোর বেশি। সুতরাং এর দ্বারা আমেরিকাই লাভবান হবে সব থেকে বেশি। তৎসত্ত্বেও এই চুক্তি ভারতকে পরমাণু বোমায় আরও শক্তিধর হওয়ার সুযোগ করে দিল। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে ফেলেছে, তার দরকার ছিল মার্কিন স্বীকৃতি। সেটা ভারতও পেল, বিনিময়ে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি পরমাণু অস্ত্রহীন দেশগুলিকে আনবিক যুদ্ধের যে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে ভারত সেই চক্রান্তেরও শরিক হল — শান্তির জন্য বিদ্যুতের নামে।

এনপিটি এবং সিটিবিটি তে স্বাক্ষর না করেও ভারত যে পরমাণু প্রযুক্তি চালাচ্ছে এবং রীতিমতো বোমা বানিয়ে বসে আছে আমেরিকার তা অজানা নয়, তবুও আমেরিকা ভারতকে দিব্বি সুযোগ দিচ্ছে, অথচ ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা হুঙ্কার দিয়ে যাচ্ছে, তাকে সিটিবিটিতে স্বাক্ষর করার জন্য এবং শর্তাবলী মানার জন্য চাপ দিয়েই যাচ্ছে। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইরানের প্রতি ভারতের আচরণ লক্ষণীয়। ভারত আমেরিকাকে তুষ্ট করতে আন্তর্জাতিক পরমাণু তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় ইরানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকার পক্ষে ভোট দিয়েছে। আবার জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলনে ইরানের সার্বভৌমত্বের পক্ষে ভারতসওয়াল করেছে। বিবৃতি দিয়ে বলেছে, ইরানের সঙ্গে সমস্যাবলীর সমাধান কূটনৈতিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করতে। আসলে ভারতকেও ভাবতে হচ্ছে ইরান যেন হাতের বাইরে চলে না যায়। আধিপত্যবাদী লিপ্সার ফলেই এই দ্বৈত আচরণ।

২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সময় এমন নিকৃষ্ট ভূমিকাই নিয়েছিল ভারতের বুর্জোয়া সরকার। ইরাক যুদ্ধের সময় ভারত সরকার সংসদে আমেরিকার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নিন্দা প্রস্তাব পর্যন্ত নেয়নি; ভারতের জনগণের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা লক্ষ্য করে দায়সারা গোছের যতটুকু না বললেই নয়, তার বাইরে সরকার যায়নি। এর দ্বারা ভারত পরোক্ষে ইরাক আক্রমণকারী মার্কিন-ব্রিটেনের পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার মিত্র দেশ ইজরায়েল, আর দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত। ইরাক আক্রমণের সময় আমেরিকার কথামতো ভারতের বুর্জোয়া সরকার সৈন্য পাঠাতে চাইলেও শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণের চাপে পাঠাতে পারেনি; কিন্তু সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে উৎখাত করে আমেরিকা যে পুতুল সরকার বসিয়েছে ভারত সরকার তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারত ক্রমশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ভারত-ইজরায়েল সামরিক চুক্তিও হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে আদতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে সিগন্যাল পেয়েছে, তার জোরেই পেন্টাগনের কর্তারা ভারতে এসে ভারতকে ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে শান্তি রক্ষার নামে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল।

ভারত দক্ষিণএশিয়ায় একটা বৃহৎ শক্তি হিসাবে দাঁড়াতে চায়। বিশ্ব যখন সমাজতান্ত্রিক শিবির ও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে বিভক্ত সেই পর্বে বৃহৎ শক্তি হিসাবে মাথা তুলতে ভারত সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করলেও মূলগতভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ থাকে এবং তার ফলে আমেরিকার সঙ্গে তার একটা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবলুপ্তির পর একমেরু বিশ্বে ভারত আমেরিকার ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এই সুযোগে ভারতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে আমেরিকা যেমন দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বাড়াতে সচেষ্ট হয়, তেমনি আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে ব্যবহার করে ভারতও বিদেশে প্রভাব বাড়াতে চায়। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলি বিশ্ববাজারের ভাগ পেতে, ইরাকের তেল সম্পদ লুটের সুযোগ নিতে এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকে পুনর্গঠনের ঠিকাদারি পেতে সক্রিয় হয়। মুনাফা লুণ্ঠনের এই পারস্পরিক স্বার্থবোধই ভারতকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ভাগ-বাঁটোয়ারা ও যুদ্ধ চক্রান্তের ছোট হিস্যাদারে পরিণত করেছে।

ভারতের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর এই আকাঙ্ক্ষাই চরিতার্থ করেছে পূর্বতন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার এবং বর্তমানে করে যাচ্ছে সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। এনডিএ সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র আমেরিকা সফরে গিয়ে উগ্র ইহুদীবাদীদের এক সভায় ইজরায়েল, আমেরিকা ও ভারত এই তিন 'গণতন্ত্রে'র ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

### সিপিএম পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী জোটের কৌশলী সঙ্গী

এনপিটি এবং সিটিবিটিতে স্বাক্ষর না করার ঘটনা দেখিয়ে সিপিএম-সিপিআই'এর মত তথাকথিত বামদলগুলি ভারতকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তির শক্তি হিসাবে 'হিরো' বানিয়েছিল। এর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীআকাঙ্ক্ষা কীভাবে কাজ করছে সেটা তারা জনগণের কাছ থেকে আড়াল করেছে। আজ পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে তারা একই অবস্থান নিচ্ছে। একচেটিয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর বক্তব্যকে ধ্বনিত করেই সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি 'হিন্দুস্তান টাইমস' পত্রিকায় লিখেছেন, ''অসামরিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক প্রযুক্তিকে ব্যবহারের কাজে ভারত পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। এর মধ্য দিয়ে জ্বালানি সমস্যা মিটবে এবং ভারত পারমাণবিক জ্বালানি হিসাবে ইউরেনিয়ামের পরিবর্তে থোরিয়াম ব্যবহারের দিকে যাবে।''

প্রথম প্রশ্ন হল — কোন্ ভারতবর্ষ? কোন্ শ্রেণী ক্ষমতায়? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, থোরিয়াম ব্যবহার করে কী করা হবে? শেষ পর্যন্ত তো বোমা? সকলেই জানেন, থোরিয়াম ব্যবহার করে বোমা বানানোর প্রযুক্তিতে অনেকটাই এগিয়ে গেছে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। তাহলে দাঁড়াচ্ছে— ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে 'বোমা বানানোর' প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আরও শক্তিধর হয়ে ওঠার 'স্বাধীন' ও 'সার্বভৌম' অধিকারই সিপিএম নেতৃত্ব সুরক্ষিত করতে চাইছেন। এই অধিকার, এই গৌরব, আমেরিকার কাছে নতি স্বীকার না করা, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি বুক্‌নির আড়ালে তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে শাসকশ্রেণীর তাঁবেদারে পরিণত করতে চাইছেন, চাইছেন তাদের যুদ্ধ রাজনীতির শরিক বানাতে। এটাই তো চায় শাসকশ্রেণী ও তার প্রত্যক্ষ শ্রেণীদল কংগ্রেস ও বিজেপি। এই প্রশ্নে তাই বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম প্রমুখ শক্তিগুলো দেশ ও বিদেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটা অঘোষিত সাম্রাজ্যবাদী ব্লক গড়ে তুলেছে। এই ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলগুলোকে, যাদের লেনিন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের 'এজেন্ট' বলেছিলেন।

### কার হাতে ও কেন বোমা?

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের টার্গেট হিসাবে যে উত্তর কোরিয়া আক্রান্ত হওয়ার দিন গুণছে, বিপন্ন অবরুদ্ধ এই রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য পরমাণু বোমায় শক্তিশালী হওয়া, অথবা হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসের পর বিশ্ব সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে যে সোভিয়েতের পরমাণু বোমায় ও সামরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব (যা সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর জোর করে শান্তি চাপিয়ে রাখার জন্যও বাস্তব প্রয়োজন) অর্জনের চেষ্টা, আর ভারতের বা আমেরিকার মত দেশের সামরিক শক্তির বৃদ্ধি বা পরমাণু বোমায় অধিকতর বলীয়ান হওয়াকে কি এক দৃষ্টিতে কোনও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি দেখতে পারে? ইরানের মত দেশ যে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির থ্রেট-এর মুখে দাঁড়িয়ে, যে শক্তিটা ইরাকে মার্কিন-বৃটেনের দখলদারীর পর মধ্যপ্রাচ্যে শেষ ঘাঁটি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, যে শক্তির হাতে পরমাণু বোমা থাকলে মার্কিন-ইস্রায়েলের পাল্টা ব্লক হিসাবে এতদঅঞ্চলে দাঁড়াতে পারে, তার হাতে পরমাণু বোমার সঙ্গে কি ফ্রান্সের বা আমেরিকার হাতে বোমার তুল্যমূল্য বিচার হতে পারে? ওখানে আজ মিশর নেই, সৌদি আরবও দালাল। ইরানের পতন ঘটলে বা মার্কিন তাঁবেদারে গেলে ইরানের তেল গ্যাস ভাণ্ডার দখল নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বাঘটি

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

# উত্তর কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষায় বাধ্য হল কেন

উত্তর কোরিয়ার সাম্প্রতিক পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার (৯ অক্টোবর, ২০০৬) প্রতিক্রিয়ায় চারিদিকে পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যমে একটা গেল গেল রব উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তাদের ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহ ও তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম নিরবচ্ছিন্ন প্রচার করে চলেছে, এর ফলে নাকি কোরিয় উপদ্বীপ অঞ্চলে সমস্ত রকম শক্তির ভারসাম্য একেবারে ধূলিসাৎ, বিশ্বশান্তি বিপন্ন, বিপন্ন জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণ মানুষ। অভিযোগের তীর স্বভাবতই উত্তর কোরিয়ার দিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথায় তথাকথিত এই 'শয়তানের অক্ষের' অন্তর্ভুক্ত 'দুর্বৃত্ত' রাষ্ট্রটি নাকি আন্তর্জাতিক চুক্তির কোনও তোয়াক্কা না করেই এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রটির পরীক্ষা করেছে! তাই অবিলম্বে দরকার তার শাস্তিবিধানের। তাই মার্কিন চাপে নিরাপত্তা পরিষদে প্রায় সাথে সাথেই উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ জারির প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে প্রস্তাবটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াও। উত্তর কোরিয়া অবশ্য এই পুরো ব্যাপারটিকেই তাদের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধঘোষণা বলে অভিহিত করে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, পরমাণু প্রযুক্তি আয়ত্ত করার লক্ষ্যে উত্তর কোরিয়ার যে এই সফল প্রয়াস, তা কি আদৌ কোনও দুর্বৃত্তসুলভ মনোভাবের ফসল, না কি বিভিন্ন পরমাণু শক্তিধর দেশ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ক্রমাগত যে যুদ্ধপ্রস্তুতি চালাচ্ছে ও হুমকি দিচ্ছে — তা-ই তাকে বাধ্য করেছে আজ এই পথে যেতে?

### সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে অবিভক্ত কোরিয়া ভেঙে হ'ল দু'টি দেশ

বর্তমানে যে অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দেশ দু'টি অবস্থিত, চীন দেশের উত্তর প্রান্ত সংলগ্ন পীত সাগরের মধ্যে প্রলম্বিত সেই উপদ্বীপটিতে দীর্ঘ যুগ ধরেই কোরিয় জাতির বাস। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বেই তারা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বৃহৎ শক্তি যথা চীন, মঙ্গোলিয়া বা জাপানের সাথে লড়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষা করে এসেছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রায় প্রারম্ভিক কালে তারা ঐ অঞ্চলের নব-উদীয়মান জাপ-সাম্রাজ্যবাদের কাছে ১৯১০ সাল নাগাদ পদানত হয়ে পড়ে। অবশ্য ঐ সময় শুধু কোরিয়া নয়, চীনের উত্তর দিকের এক বিশাল অংশও জাপানের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে চলে যায়। এই অবস্থা বজায় থাকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, যতদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে জাপানের সমগ্র সাম্রাজ্যই তার হাতছাড়া হয়ে না যায়। এই সময় থেকেই কোরিয়ার ইতিহাসেও দেখা যায় এক সম্পূর্ণ নতুন মোড়।

জাপ-অধিকৃত কোরিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে খুব স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল কোরিয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। পার্শ্ববর্তী চীনের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সামান্য উত্তরে অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শগত প্রভাবে এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও ধীরে ধীরে সাম্যবাদী আদর্শের প্রভাব পড়তে শুরু করে। যুগটা ছিল যেহেতু বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ, আন্তর্জাতিকভাবে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ তখন প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে, সেহেতু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যেও বুর্জোয়াদের অবস্থান ছিল অনেকটাই আপসমুখী। ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে যত বামপন্থী নেতৃত্বের প্রভাব বাড়তে থাকে, সাধারণ মানুষ, দরিদ্র কৃষকরা যতই সেই আন্দোলনের পিছনে আরও বেশি বেশি করে জমায়েত হতে থাকে, আপসকামী জাতীয় বুর্জোয়ারা ততই ধীরে ধীরে এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও জাপ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের একপ্রকার তাঁবেদারে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সাল নাগাদ অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, দেশের উত্তরাঞ্চলে সংগ্রামী কোরিয় জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টরা কিম ইল সুং-এর নেতৃত্বে জাপ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে রীতিমতো লড়াই চালাতে শুরু করে।

অবস্থা যখন অনেকটা এইরকম, সেই সময় '৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। এই শেষ মুহূর্তটিকেই কিন্তু আর এক অর্থে পরবর্তী তথাকথিত ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা বলে অভিহিত করা চলে। কারণ, সেই মুহূর্তে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর প্রাথমিক লক্ষ্যই ছিল যতটা সম্ভব বেশি অঞ্চলে নিজেদের অধিকার কায়েম করা। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের সাথে সাথেই মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাকআর্থারের নির্দেশে মার্কিন বাহিনী কোরিয়ায় আসে এবং তড়িঘড়ি অবতরণ করে তখনও পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত শান্ত দক্ষিণাঞ্চলে। এই অঞ্চলের শাসনভার জাপানের হাত থেকে তাদের হাতে চলে এলে ৫০০০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোরিয়া দেশটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। মার্কিন বাহিনী তাদের দখল করা দক্ষিণ অঞ্চলে নিজেদের একটি পুতুল সরকার খাড়া করে এবং '৩৮ প্যারালাল' বরাবর সীমা নির্ধারণ করে সমগ্র অঞ্চলটিকে উত্তর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু স্বাধীনতাকামী কোরিয় জনগণ নিজ দেশের এইরকম বিভাগ বা রি সিনমানের পুতুল সরকারকে মেনে নিতে কোনওভাবেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে মার্কিন অধিকৃত দক্ষিণাঞ্চলেও স্বাধীনতাপ্রেমী কোরিয় জনগণের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ চলতেই থাকে। একদিকে মার্কিন মদতপুষ্ট পুতুল রি সরকারের উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ছিল আগ্রাসী মনোভাব, অন্যদিকে সমগ্র কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী জনগণের দেশকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার তাগিদ। ফলে ১৯৫০-এর মাঝামাঝি শুরু হয়ে যায় উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সংঘাত। সংঘাতের কয়েক দিন গড়াতে না গড়াতেই মার্কিন মদতে গড়ে ওঠা প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ কোরিয় বাহিনীর অবস্থা হয়ে ওঠে সঙ্গীন। উত্তরের গণতান্ত্রিক কোরিয়ার জাতীয় বাহিনী অতিদ্রুত অগ্রসর হতে শুরু করে এবং একের পর এক অঞ্চল দক্ষিণ কোরিয় বাহিনীর হাতছাড়া হতে থাকে। এর কারণ অবশ্য শুধুমাত্র উত্তর কোরিয় বাহিনীর সামরিক ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত ছিল না, দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল উত্তর কোরিয় বাহিনীর প্রতি বিপুল সমর্থন। মার্কিন মদতপুষ্ট রি সরকার সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তরের বাহিনীর প্রতি এই প্রবল সমর্থন বুঝতে পেরে আতঙ্কে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা তখন অতিদ্রুত উত্তরের বাহিনীর জনসমর্থনের এই ভিতকে দুর্বল করে দিতে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট সহ সকল স্বাধীনতাকামী মানুষকে বন্দী করার ও গণহত্যার নির্দেশ জারি করে।

### মার্কিন বাহিনী ও তার মদতপুষ্টদের নির্বিচার গণহত্যা

সোল শহরে রাজনৈতিক বন্দীদের হত্যা দিয়ে এই নরমেধ যজ্ঞ শুরু হলেও সেখানে প্রাথমিকভাবে তারা খুব একটা সফল হতে পারেনি। কারণ ১০০ জন মতো বন্দীকে হত্যা করার মধ্যেই উত্তর কোরিয় বাহিনী সেখানে ঢুকে পড়ে এবং অবশিষ্ট সকলকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পুসানে মার্কিন ও তাদের তাঁবেদার দক্ষিণ কোরিয় বাহিনীর চালানো এই গণহত্যায় অন্তত ৫০ হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষের প্রাণ যায়। (সূত্র ঃ কোরিয়া সিন্স ১৮৫০, স্টুয়ার্ট লোন এবং গাভান ম্যাককরম্যাক)।

অবশ্য এখানেই এই নারকীয় নরমেধ যজ্ঞ শেষ হয় না। খেপে খেপে নানা জায়গাতেই চলতে থাকে এরকম বহু গণহত্যার ঘটনা। এমনকী আজও মাঝে মাঝেই হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে সেদিনের সেইসব হতভাগ্যের স্তূপীকৃত দেহাবশেষ, হঠাৎ হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নানা গণকবর। যেমন ৪ সেপ্টেম্বর, বাহিনীই এই হতভাগ্যদের ট্রাকে করে এইখানে নিয়ে আসে এবং লম্বা গর্ত খোঁড়ার আদেশ দেয়। যথেষ্ট গভীর গর্ত খোঁড়া হলে তাদের অর্ধেক জনকে গুলি করে হত্যা করা হয় ও বাকিদের তাদেরকে কবর দিতে বলা হয়। পরে বাকিদেরও হত্যা করা হয় (সূত্র ঃ www.kimsoft.com)।

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর কোরিয়ার সরকারের তরফ থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবকে লেখা এক চিঠিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের বাহিনীর নামে মোতায়েন মার্কিন বাহিনী উত্তর কোরিয়ার মাটিতেও এরকম কত গণহত্যা চালায় তার একটা হিসাব প্রকাশ পেয়েছে। তাতে জানতে পারা যায় যে, ঐ সময় মার্কিন বাহিনী যে সামান্য কিছু সময়ের জন্য উত্তর কোরিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল তার মধ্যেই তারা সিনচন প্রদেশে ৩৫,৩৮০ জন, রাজধানী পিয়ং ইয়াং-এ ১৫,০০০ জন, আনাক প্রদেশে ১৯,০৭২ জন, সংহোয়া প্রদেশে ৫,৫৪৫ জন, উনরিয়ুল প্রদেশে ১৩,০০০ জন, পিয়ং সানে ৫,২৯০ জন এবং হায়ে জু শহরে ৬,০০০ মানুষকে হত্যা করে। এর মধ্যে সিনচন প্রদেশের হত্যাকাণ্ডটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে ইউ এস ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ১৯ নম্বর রেজিমেন্ট এই প্রদেশে মাত্র ৫২ দিনের জন্য অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছিল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা এই অঞ্চলের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষকে হত্যা করে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের বেশিরভাগই ছিল বৃদ্ধ, মহিলা বা নেহাৎই দুধের শিশু। প্রায়ই তাদের দলবদ্ধভাবে কোনও বন্ধ শেল্টারের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটানো হত, যাতে কেউই না বাঁচতে পারে। (সূত্র ঃ www.kimsoft.com 2002 / sinchun.htm)

শুধু এইসব গণহত্যাই নয়, ১৯৫০-৫৩ সালের এই কোরিয় যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী যথেচ্ছভাবেই সামরিক-অসামরিক সব অঞ্চলেই বোমাবর্ষণ করে সারা দেশটিরই পরিকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করে। যেমন, ১৯৫২ সালের জুন মাসে প্রায় ৫০০ বোমারু বিমান থেকে বোমা ফেলে ইয়ালু নদীর উপর বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে মার্কিনরা উত্তর কোরিয়ার শুধুমাত্র বিভিন্ন শহরেই মোট ৬৯৭ টন বোমা ও ১০ হাজার লিটার নাপাম বর্ষণ করে, যার ফলে অন্তত ৬০০০ নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটে (সূত্র ঃ কোরিয়া সিন্স ১৮৫০, স্টুয়ার্ট লোন এবং গাভান ম্যাককরম্যাক)। বাস্তবিক ৫০-৫৩ সালের ঐ কোরিয় যুদ্ধে মার্কিন বাহিনী ঐ দেশে গড়ে দৈনিক ৮০০ টন করে বোমা বর্ষণ করে। সমগ্র কোরিয় উপদ্বীপ জুড়ে অন্তত ৪০ লক্ষ মানুষ সেদিন ঐ যুদ্ধে মার্কিন ও তাদের তাঁবেদার দক্ষিণ কোরিয় বাহিনীর নৃশংসতার শিকার হয়ে নিহত হন। এদের মধ্যে এক বিরাট অংশই আবার বাস্তবে নির্বিচার গণহত্যার শিকার।

১৯৫০-৫৩ সালের এই যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয় ও মার্কিন বাহিনীর হাতে এত অসংখ্য নিরীহ সাধারণ মানুষ নির্বিচার হত্যার শিকার হন যে, তুলনায় তা হয়ত হিটলারের নাৎসি বাহিনীর নৃশংসতাকেও টেক্কা দিতে পারে। আসলে এর লক্ষ্য ছিল একদিকে বামপন্থীদের সঙ্গে এতটুকু পরিচয় আছে বা তার সম্ভাবনাও আছে এরকম একটি মানুষও যাতে বেঁচে না থাকতে পারে, অন্যদিকে সারা দেশ জুড়ে এমন একটা ভয়ঙ্কর ভীতির আবহ তৈরি করা যাতে বামপন্থা বা সাম্যবাদের নামও আর কেউ মুখে আনতে সাহস না পায়। এইরকম একটা অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী সামরিক হস্তক্ষেপের

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

*উত্তর কোরিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে কেরালার কোচি শহরে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ*

# জাপানও পুনরায় বিপুল অস্ত্রসজ্জা শুরু করেছে

*পাঁচের পাতার পর*

জবাব দিতে মার্কিন পরমাণু অস্ত্রের পরোয়া না করে কোরিয় জনগণের সাহায্যের জন্য কমিউনিস্ট চীনের নেতৃত্ব কোরিয়ায় ভলান্টিয়ার বাহিনী যাওয়ার অনুমতি দেয়। চীনা ভলান্টিয়ারদের সহায়তায় বলীয়ান কোরিয় বাহিনীর হাতে শেষপর্যন্ত মার্কিন বাহিনী আক্ষরিক অর্থেই পরাজিত হয়। নিজেদের প্রায় অর্ধলক্ষ সৈন্যের প্রাণ খেসারত দিয়ে শেষপর্যন্ত তারা যখন ১৯৫৩ সালে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয় তখন যে '৩৮ প্যারালাল' থেকে তারা যুদ্ধ শুরু করেছিল, দেখা যায় তার থেকে এক ইঞ্চিও তাদের অগ্রগতি ঘটেনি।

### এখনও উত্তর কোরিয়া মার্কিন ও জাপ বাহিনীর দ্বারা কার্যত অবরুদ্ধ

প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সেদিন শেষ হয় বটে, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজও কোরিয়া উপদ্বীপ ছেড়ে চলে যায়নি। গণপ্রজাতন্ত্রী উত্তর কোরিয়ার সার্বভৌমত্বটুকুকেও তারা আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি। তৈরি করেনি তাদের সাথে কোনও স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্কও। উত্তর কোরিয়াকে লক্ষ্য করে তাদের হুমকি প্রদর্শনও বন্ধ হয়নি এতটুকুও। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও উত্তর কোরিয়া একযোগে আক্রমণ করতে পারে — এই অজুহাত দিয়ে ও দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তার নামে সেখানে দীর্ঘকাল মোতায়েন রাখা হয়েছে ৩৭ হাজার মার্কিন সেনা। সোভিয়েতের পতনের পরেও আজও তাদের সেই বাহিনী সেখানে যথারীতিই মোতায়েন। শুধু তাই নয়, কোরিয়ার দক্ষিণ উপকূলে, তাদের দু-দুটি যুদ্ধ জাহাজ (ইউ এস এস কার্টিস উইলবার এবং ইউ এস এস ফিট্‌জেরাল্ড) নিত্য টহলরত। বলা বাহুল্য, দু'টি ডেষ্ট্রয়ারই অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত ও দূর নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সম্বলিত। এছাড়াও প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দু'টি দ্বীপ গুয়াম ও হাওয়াই-এ তাদের নৌ ও বিমান ঘাঁটি বর্তমান, যেখানেও তাদের ২২ হাজারেরও বেশি সৈন্য ও নানা ধরনের উন্নত বিমান, ৩টি বিমানবাহী জাহাজ এবং আরও বহু ধরনের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাওয়াই দ্বীপ থেকে প্রতিনিয়ত মার্কিন নজরদারি ও গোয়েন্দা বিমান উত্তর কোরিয়াকে লক্ষ্য করে উড়ে যায়। ২০০৬ সালের ১৬ জুন উত্তর কোরিয়া সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, শুধুমাত্র এ বছরের মে মাসে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ১৭০ বার উত্তর কোরিয়ার আকাশ সীমায় হানা দেয় (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, নিউইয়র্ক, ১৭-০৬-০৬)। অর্থাৎ উত্তর কোরিয়াকে আজও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সামরিকভাবে ঘিরেই রেখেছে ও নিত্য সামরিক হুমকি ও যুদ্ধ প্ররোচনা দিয়েই চলেছে।

অপরদিকে প্রতিবেশী জাপানও পুনরায় বিপুলভাবে অস্ত্রসজ্জা শুরু করেছে। বর্তমানে বিশ্বে যেসব দেশ সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি খরচ করে তার অন্যতম হচ্ছে জাপান। তার সামরিক খাতে বর্তমানে খরচের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ হাজার কোটি ডলার। বলাবাহুল্য সেখানেও তাদের পিছনে রয়েছে মার্কিন বরাভয়ের হাত। তাদের সাথেই দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তির ভিত্তিতে জাপান তার অস্ত্রশক্তি ও ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লাকে ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে। এরও পরোক্ষ লক্ষ্য সেই উত্তর কোরিয়াই। এমতাবস্থায় যে কোন দেশের পক্ষেই আত্মরক্ষার তাগিদে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে নিজেদের সমরশক্তি বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কীই বা উপায় থাকতে পারে? বিশেষ করে উত্তর কোরিয়ার মানুষের স্মৃতিতে যেখানে মার্কিন আগ্রাসন ও তাদের অত্যাচারের ঐরকম ভয়াবহ স্মৃতি দগদগে ঘায়ের মতোই চির জাগরূক এবং এখনও সামরিকভাবে সে দেশ অবরুদ্ধ। আর সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তির ললিত বাণীতে ভুলে অস্ত্র ত্যাগের যে কী ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে তার উদাহরণও তো হাতের কাছেই মজুত — সাদ্দাম হুসেনের ইরাক। ফলে ঐ পথে পা বাড়ানো তো উত্তর কোরিয়ার পক্ষেও আত্মহত্যারই সামিল। তাছাড়া ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়া, চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে আলোচনায় উত্তর কোরিয়া এই চুক্তিতেও স্বাক্ষর করে যে, তারা সমস্ত রকম পারমাণবিক কর্মসূচি থেকে সরে আসবে। এ তো তাদের তরফে শান্তি স্থাপনে ব্যগ্রতারই সূচক। কিন্তু তার মাত্র চারদিন পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নানা অজুহাতে ঐ চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তাদের উপর ব্যাপক আর্থিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয়। তাছাড়া প্রতিমুহূর্তে তাকে ঘিরে যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং তাকে পিষে ফেলার হুমকি তো বজায় আছেই। এ অবস্থায় ঐ চুক্তিকে মর্যাদা দিয়ে পারমাণবিক প্রযুক্তি বর্জন করা তো বোকামির ও মুর্খামিরই পরিচয়। বরং আত্মরক্ষার্থে যত দ্রুত সম্ভব পারমাণবিক অস্ত্রপ্রযুক্তি অর্জন করাই তখন স্বাভাবিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। উত্তর কোরিয়া তাই করেছে। তারা ঐ অঞ্চলে যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতেই বসতে চায়, কিন্তু নিজেদের হাতে যথেষ্ট শক্তি ও যুদ্ধ ক্ষমতা বজায় রেখেই। কারণ এক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার সেটাই একমাত্র গ্যারান্টি।

ফলে উত্তর কোরিয়া আজ যে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে, এ পথে যেতে বাস্তবে আমেরিকাই তাকে বাধ্য করেছে। কারণ প্রবল পরমাণু শক্তিধর আমেরিকার সাথে লড়াই চালাবার মতো শক্তি অর্জন করা ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে একটানা মার্কিন হুমকি ও তাকে ঘিরে সমরসজ্জা করে চলা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নতজানু করে আলোচনার টেবিলে বসানোর আর কোনও পথই তাদের সামনে খোলা ছিল না। উত্তর কোরিয়া সরকারের বক্তব্যেও আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই। তাঁরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা আমেরিকার সাথে মুখোমুখি আলোচনার টেবিলেই বসতে চান এবং পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বাস্তবে তাঁদের সেই আগ্রহেরই প্রকাশ। তাছাড়া আর একটি বিষয়ও যথেষ্ট লক্ষণীয়। গত জুলাই মাসে উত্তর কোরিয়ার ৩৬০০ কিলোমিটার পাল্লার আন্তর্মহাদেশীয় টেপোডং-২ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ ও অক্টোবরের সফল পরমাণু অস্ত্রপরীক্ষার পর আজ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াও তাকে সমঝে চলতে বাধ্য হচ্ছে। আক্রান্ত হলে তারা যে সরাসরি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানস্থ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে পরমাণু আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা ধরে, উত্তর কোরিয়ার এই পাল্টা হুমকি যে কোনও ফাঁকা আওয়াজ নয় তা বুঝতে পারা মাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরাও ইতিমধ্যেই সুর নরম করে ফেলেছে। তারা আজ নিজেদের ইচ্ছে মতো উত্তর কোরিয়ার উপর হামলা চালাবার পরিবর্তে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে এগোতেই আগ্রহী। এই ঘটনাই প্রমাণ করে, উত্তর কোরিয়ার এই পরমাণু অস্ত্র অর্জন ঐ অঞ্চলে সরাসরি যুদ্ধের সম্ভাবনা ইতিমধ্যে অনেকটাই কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখন তারা ব্যাপক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়ে উত্তর কোরিয়াকে অন্য ধরনের চাপের মধ্যে ফেলে দিতে চায়, যা সেদেশের মানুষের কাছে প্রায় আরেক যুদ্ধ পরিস্থিতিরই মতো। বিশ্বের শান্তিকামী সচেতন জনগণের তাই আজ এই নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠা দরকার, রাষ্ট্রসংঘকে উত্তর কোরিয়ার উপর ঐ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা দরকার। বিশ্বের সমস্ত শান্তিপ্রিয় সচেতন মানুষের তাই উচিত এই প্রশ্নে উত্তর কোরিয়ার সমর্থনেই এগিয়ে আসা, জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলে মার্কিন ও জাপ সাম্রাজ্যবাদকে তাদের সাথে মুখোমুখি শান্তি আলোচনায় বসতে বাধ্য করা, এবং তাদেরকে উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে বাধ্য করা। ঐ অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের আজ এটাই একমাত্র পথ।

## উত্তর কোরিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

**(ওপরে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি ও নীচে তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে বিক্ষোভের ছবি)**

# ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে

*চারের পাতার পর*

যে বাড়তি শক্তির জোগান পাবে—বিশ্বশান্তির পক্ষে তা কোন সহায়ক হতে পারে কি? নাকি আগ্রাসী ক্ষমতাই বাড়বে? মনে কি পড়ে না—পরমাণু বোমার বিজ্ঞান হিটলারের হাতে চলে যাওয়ার আশংকায় বিজ্ঞানীরা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমেরিকায়। বোমা যদি দিতে হয় তা যেন ফ্যাসিস্তের হাতে দিতে না হয়। এটুকু শুভবুদ্ধি তাদেরও তো ছিল। পরে হিরোসিমা-নাগাসাকির ঘটনার পর পথিকৃৎ পরমাণু বিজ্ঞানীরা মাথার চুল ছিঁড়েছেন। এটুকু বলছি এজন্যই যে, আজ বিজ্ঞানীদের যুদ্ধ চক্রান্তের শরিক শুধু নয়, তাদের মেধাকে যুদ্ধের মেশিনারীর নাট-বল্টুতে, দাসে পরিণত করে ছেড়েছে সাম্রাজ্যবাদ। এই চক্র থেকে মুক্তির প্রয়োজন তাদেরও। বিশ্বের বহু সংখ্যক বিজ্ঞানীর শান্তির সপক্ষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে গৌরবজনক ভূমিকা যুদ্ধচক্রান্তকে যেমন দুর্বল করেছে তেমন বিজ্ঞানকে জনকল্যাণের জন্য ব্যবহারের, প্রয়োগের রাস্তাটাও কিছুটা প্রশস্ত করেছে। শুধু যুদ্ধ— যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকেও আজ পুঁজিবাদী-সামাজ্যবাদী চক্র থেকে মুক্তকরার ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের জন্য, শান্তির জন্য লড়াই-এর এও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

### জঙ্গি শান্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজন

আজ বিশ্ব জুড়ে, শান্তির সপক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি নিতান্তই দুর্বল। সাম্রাজ্যবাদই নিয়ন্ত্রণকারী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। তবু দেশে দেশে জনগণের যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সুসংগঠিত সুপরিকল্পিত ভাবে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামের পরিপূরকভাবে গড়ে তুলে বিকল্প এক বিশ্বশক্তি, জঙ্গি শান্তির শক্তি হিসাবে অভ্যুত্থান ঘটানো দরকার। প্রকৃত কমিউনিস্টদেরই এই আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। এতে যুক্ত করতে হবে সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। যুদ্ধের মধ্যেও শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর 'পিতৃভূমি' রক্ষার উন্মাদনায় কমিউনিস্টদের ভেসে যাওয়া চলে না। মনে রাখতে হবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হচ্ছে শাসকশ্রেণীর পুঁজিপতি শ্রেণীর বাজার দখলের যুদ্ধ। ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধে জনগণকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয় মাত্র।

তাই যুদ্ধোন্মাদনার পরিবেশেও প্রকৃত কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিকতা বোধের কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। তেমন পরিবেশেও শাসকশ্রেণীকে অর্থাৎ নিজ দেশের শাসকশ্রেণী ও পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার সংগ্রামে শিথিলতা দেখানো চলে না।

এই সংগ্রামের সাফল্যের সাথে সাথে যুদ্ধের শক্তি কমজোরি হয়, শান্তির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

আজ এই সংগ্রামে আত্মনিবেদনের মধ্যেই আছে মনুষ্যত্বের মুক্তির সাধনা। এই মুক্তি সাধনার অঙ্গ হিসাবেই বুঝতে হবে ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির পিছনের শ্রেণীস্বার্থ। সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের দাবি, যুদ্ধের অবসান ও শোষণমুক্তির দাবিতে এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই। এই সংগ্রামের গতিপথে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতি নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

# সিঙ্গুর ঃ রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধের ডাক

*একের পাতার পর*

পালন করে সরকারের কৃষক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে। কিন্তু সিপিএম সরকার ন্যূনতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরও তোয়াক্কা করছে না, জনগণের মতামতের কোনও মর্যাদাই দিচ্ছে না। এমনকী, ট্রেড সিক্রেটের নামে টাটাকে জমি দেবার শর্ত কী — তাও তাঁরা জানাবেন না বলে চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন। যেন পশ্চিমবঙ্গ তাঁদের জমিদারি এবং রাজ্যের সবকিছুকেই তাঁরা ইচ্ছেমত পুঁজিপতিদের লুঠের জন্য বিলিয়ে দিতে পারেন। শুধু সিপিএম কেন, কংগ্রেস-বিজেপি সহ অন্যান্য দল যে যেরাজ্যে ক্ষমতাসীন সেখানেই জবরদস্তি কৃষকের থেকে জমি কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আবাদী-অনাবাদী কোন বিচারই কেউই করছে না। লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবনের বিনিময়ে পুঁজিপতিদের তুষ্ট করার এই মারণযজ্ঞ গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয়েছে। যে কংগ্রেস তাদের শাসিত রাজ্যগুলিতে নিজেই এ কাজ করছে, সেই কংগ্রেসই এ রাজ্যে তার বিরোধিতা করছে। সিপিএমও ঠিক একইভাবে অন্য রাজ্যে বিরোধী দল হিসেবে ভোটের স্বার্থে এ কাজের প্রতিবাদ করছে, আন্দোলনের মহড়া দিচ্ছে, জনসাধারণের ক্ষোভকে নিজেদের ভোট-বাক্সে পোরার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জনসাধারণকে নিজেদের স্বার্থেই এই দলগুলিকে চিনে নিতে হবে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

এ রাজ্যের কেবল সিঙ্গুরে নয়, সিপিএম সরকার রাজ্যের ১৮টি জেলাতেই কৃষকের জমি কেড়ে নেবার পরিকল্পনা নিয়েছে। টাটা-আম্বানি-সালিম সহ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে কোথাও চুক্তি হয়ে গেছে, কোথাও বা তা প্রস্তাব আকারে রয়েছে। পুঁজিপতিদের নামমাত্র মূল্যে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, ট্যাক্স ছাড় দিয়ে, অর্থাৎ সরকারি কোষাগারের টাকা অপচয় করে ও চাষীদের পথে বসিয়ে সরকার কৃষিজমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ফলে সিঙ্গুরের কৃষক-আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না, সমগ্র রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবেই সিঙ্গুরের লড়াইকে বুঝতে হবে। তাই রাজ্যব্যাপী কৃষক সংগ্রামকে জোরদার করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সিঙ্গুরের চাষী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এজন্যই দক্ষিণবঙ্গের চাষী, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ ৩ নভেম্বর সিঙ্গুরে গিয়ে সংহতি জানাচ্ছেন।

শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার বিরোধিতা কোন সাধারণ মানুষও করে না, যদি সেই শিল্প সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপূরক হয়, যদি জমিচ্যুত চাষী-মজুর ও বেকারদের কর্মসংস্থানের তথা থাকা-খাওয়া-শিক্ষা-চিকিৎসার প্রয়োজনটুকু মেটে। তা যদি না হয়, তবে শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য শিল্প গড়তে চাষী তাদের জমি ছাড়বে কেন? আর মনে রাখতে হবে, বিচ্ছিন্নভাবে ২/৩টি শিল্প কারখানা হলেই তাকে শিল্পায়ন বলে না। শিল্পায়নের অর্থই আলাদা। শিল্পায়ন মানে ক্রমাগত একের পর এক শিল্পোদ্যোগের প্রতিষ্ঠা। এর সাথে জনগণের স্বার্থ যুক্ত থাকে এই অর্থেই যে, তাতে ব্যাপক বেকার মানুষের কাজ হয়। একমাত্র এই অর্থেই শিল্পায়ন জনস্বার্থবাহী। এ জিনিস আজকের দুনিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধীনে হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

তাই দেখা যাচ্ছে, পুঁজিপতিরা শিল্পে পুঁজি খাটানোর পরিবর্তে বেশি বেশি পুঁজি ঢালছে শেয়ারের ফাটকায়, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-ব্যাঙ্ক-ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি পরিষেবা ও সুদের ব্যবসায় এবং প্রধানত আবাসন তৈরিতে বা নগরায়নে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতেই লক্ষ লক্ষ শিল্পকারখানা বন্ধ, কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই। আমাদের দেশ এবং এরাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়। সিপিএম সরকার এই একটি-দুটি কারখানাকে, যাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে অতি নগণ্যসংখ্যক, তাকেই শিল্পায়ন বলে প্রচার করে বিপুল সংখ্যক বেকার যুবককে ধাপ্পা দিচ্ছে, প্রতারিত করছে। বড় বড় আবাসন, শপিং মল, সুইমিং পুল সহ অর্থবানদের স্ফূর্তি ও বিনোদন ক্ষেত্র হিসেবে পুঁজিপতিরা যে নগরায়নে পুঁজি ঢালছে, তাকেই সিপিএম সরকার শিল্পায়ন বলে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে এবং সেই তথাকথিত শিল্পায়নের জন্য পুঁজিপতিদের হাতে জমি তুলে দিতে কৃষকদের চাষের জমি কেড়ে নিচ্ছে। এর পরিণাম কৃষির সাথে যুক্ত মানুষের জীবনে কী ভয়াবহ হবে সেকথা এমনকী সরকারি নীতির সমর্থকরাও কবুল করতে বাধ্য হচ্ছে।

গত ২৬ অক্টোবর টেলিগ্রাফ পত্রিকায় জনৈক নিবন্ধকার কৃষি জমি কেড়ে নিয়ে শিল্প স্থাপনের পক্ষে সওয়াল করতে করতেই লিখেছেন, এইভাবে জমি নেওয়ার ফলে ঐ জমির সাথে যুক্ত খেতমজুর বা কৃষিমজুরদের অবস্থা হবে ভয়াবহ, তারা কোনও বিকল্প কাজ পাবে না। তাদের কারিগরি ট্রেনিং দিয়ে কাজের যোগ্য করে তোলা হবে বলে যেসব কথা বলা হচ্ছে, সেটাও ভিত্তিহীন। কারণ, টাটার গাড়ি তৈরির কারখানায় ওদের কাজ জুটবে না। হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে মারুতি গাড়ি তৈরির কারখানার দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি লিখেছেন, গাড়ির চেসিসের উপর বডি তৈরি ও রং করার জন্য ওখানে বিশাল ওয়ার্কশপে গেলে দেখা যাবে, কাজ করছে মাত্র ৪/৫ জন, সমস্ত কাজই হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রে। পরেই তাঁর বক্তব্য, মারুতি কারখানায় যে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, টাটার গাড়ির কারখানায় তার থেকেও আধুনিক যন্ত্র ব্যবহৃত হবে, একথা বলাই বাহুল্য। ফলে কাজে হবে না। তাহলে এই শিল্পে কৃষিজীবীদের স্বার্থ কী? একে শিল্পায়নই বা বলা যাবে কেন? সিঙ্গুরের কিছু চাষী সরকার ও সিপিএম দলের মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত হয়ে চাকরি পাবে ভেবে জমি লিখে দিয়েছিল, তারপর তারা জানলো যে, চাকরি নয়, একটা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা তাদের জন্য করা হয়েছে, কাজ কোথায় পাবে — তার কোন ঠিকানা নেই।

এই প্রতারণার বিরুদ্ধে রাজ্যের কৃষক-খেতমজুরকে সচেতন সংঘবদ্ধ করে প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল করানোটা আজ অত্যন্ত জরুরী এবং সেই জরুরী প্রয়োজনেই এস ইউ সি আই সিঙ্গুর সহ রাজ্যের সমস্ত জেলায় কাজ করে চলেছে। শুধু কিছু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভ, সংবাদমাধ্যমে প্রচার পাওয়ার স্টান্টবাজী ও চমকদারি কর্মসূচি নয়, আন্দোলনকে দাবিপূরণের লক্ষ্যে অত্যন্ত সুসংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেবার জন্য এলাকায় এলাকায় সাধারণ মানুষকে নিয়ে গণকমিটি গঠন ও ব্যাপক ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করার কাজে এস ইউ সি আই কর্মী-সংগঠকরা নিয়োজিত। সিঙ্গুরে একেবারে প্রথম থেকেই এস ইউ সি আই প্রচার, ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, মিটিং-মিছিল করে, পাড়ায় পাড়ায় গ্রুপ বৈঠক করে চাষী-মজুরদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গুরে আগত রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন, ৯ অক্টোবর সাধারণ ধর্মঘটের দিন প্রবল পুলিশি ত্রাসের মুখেই বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে চাষীদের মনোবল রক্ষা করা ইত্যাদি 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'র যাবতীয় কর্মসূচীকে সফল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

কিন্তু, আজ সিপিএম সরকার পুঁজিপতিদের সেবায় এতই মরিয়া যে, তারা যেকোন সময় সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে সিঙ্গুরের জমি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই এই আন্দোলনের প্রতি সরকার যে মনোভাব দেখিয়েছে, যেভাবে রাতের অন্ধকারে মানুষের ওপর নারী-শিশু নির্বিশেষে পশুর মত হিংস্র আচরণ চালিয়েছে এবং যেভাবে প্রতিদিন হুমকি দিয়ে যাচ্ছে তাতে এ সম্ভাবনা অত্যন্ত বাস্তব। তবে তার মোকাবিলার প্রস্তুতিও চলছে সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়। সেই সঙ্গে সরকারি এই আক্রমণ সিঙ্গুরে আছড়ে পড়ার সাথে সাথেই যাতে সারা রাজ্যের চাষী-মজুর, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণী একসঙ্গে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে তার প্রস্তুতি গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই। শুধু তাই নয়, জেলায় জেলায় জমি কেড়ে নেবার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামে-গঞ্জে-পাড়ায়, স্কুলে-কলেজে, কারখানায় সর্বত্র জনগণের সংগ্রাম কমিটিগুলি গঠন এবং ভলান্টিয়ার সংগ্রহে অগ্রাধিকার দিতে হবে, ব্যাপক প্রচার ও লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ-অবস্থান ইত্যাদি চলতে থাকবে। এই কর্মপ্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবেই ৩ নভেম্বর সিঙ্গুর অভিযান।

# বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

*একের পাতার পর*

এমনকী ১৩৪ কোটি টাকা গড় মাশুল কমলেও কৃষক, ক্ষুদ্রশিল্প ও গৃহস্থের মাশুল কমেনি। উপরন্তু কৃষি বিদ্যুতের মাশুল ২০০৪-০৫ সালের তুলনায় ৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। হয় এই বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার করতে হবে, না হলে গত বছরের মতো ভর্তুকি দিতে হবে। যতদিন না এই দাবি সরকার মানছে ততদিন বিল বয়কট চলবে। নভেম্বর মাস থেকে আরো প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছরের মতো এবছরও ৮০ শতাংশ কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহক জুন মাস থেকে বিল বয়কট করে চলেছে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ''গত বছর ২৭ অক্টোবর বিদ্যুৎ গ্রাহক বিশেষত কৃষি বিদ্যুৎগ্রাহকদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে যে বর্বর অত্যাচার চালানো হয়েছিল এই সভা সেই পাশবিকতার তীব্র নিন্দা করছে ও ধিক্কার জানাচ্ছে। এই সভা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুলি চালানোর ঘটনাকে প্রথমে চেপে যাওয়ার চেষ্টাকে ফ্যাসিবাদী লক্ষণ বলে মনে করে।

এই সভা নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষী পুলিশের শাস্তি ও খুদ্দার শেখ সহ সমস্ত আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন, তা আজও কার্যকর না করায় মুখ্যমন্ত্রীর মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা করছে।''

সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি বলেন, সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানিকে সরকার ১৪০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে, কম দামে বিদ্যুৎ দেবার ব্যবস্থা করছে কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মাশুল বাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে, জমি বিক্রি করতে অথবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করছে।

প্রাক্তন বিচারপতি অবনীমোহন সিন্‌হা বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে সকলেরই প্রতিবাদ জানাবার অধিকার আছে। গত বছর এখানে যেভাবে নিরস্ত্র বিদ্যুৎগ্রাহকদের উপর পুলিশি অত্যাচার হয়েছে তার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি হওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু সরকার বিষয়টিকে চেপে দিয়েছে।

অধ্যাপক কবি তরুণ সান্যাল বলেন, বামপন্থার নামে বর্তমান রাজ্য সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বায়নের অর্থনীতির ধারক বাহকে পরিণত হয়েছে।

সরকার পরিকল্পিতভাবেই কৃষি জমি বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেবার জন্য আজ কৃষকদের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাচ্ছে। তাই সিঙ্গুরের কৃষক এবং রাজ্যের কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একসাথে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সভার পক্ষ থেকে সঞ্জিত বিশ্বাস, অমল মাইতি, কুনাল বিশ্বাস, অনুকূল ভদ্র, তপন ঘোষ, নুরুল ইসলাম, মণিমোহন ঘোষ — এই ৭ জনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যানের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে আলোচনা করেন। স্মারকলিপিতে কৃষকদের মিটার দিয়ে ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ, গৃহস্থ ও ক্ষুদ্রশিল্পে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ — হয় মাশুল কমিয়ে অথবা ১ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে অবিলম্বে চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। সাথে সাথে সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানিকে কমদামে বিদ্যুৎ দেবার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। খরা বন্যায় ভেসে যাওয়া এলাকাগুলোতে কৃষি বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবি জানানো হয়েছে।

আলোচনায় চেয়ারম্যান মলয় দে বলেন, আগামী বছর যাতে মাশুল বৃদ্ধি না হয় এবং ক্ষুদ্র শিল্পে মাশুল কমে, সেই চেষ্টা করা হবে। ২০০৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত কৃষি গ্রাহকদের মিটার দেওয়া হবে। গ্রাহক সমিতির ভর্তুকির দাবিটি বিদ্যুৎমন্ত্রীকে তিনি জানাবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু তিনি বলেন, তবে চাষীরা বর্ধিত বিল না দিলে লাইন কাটা হতে পারে। তখন প্রতিনিধিরা দৃঢ়তার সাথে চেয়ারম্যানকে জানান যে, লাইন কাটতে গেলে গত বছরের থেকেও ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ করা হবে।

প্রতিনিধিরা বলেন, আমরা কোন মতেই অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরলের মতো পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিতে দেব না — যেকোন মূল্যে তাকে প্রতিরোধ করা হবে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ''ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মতো বিপুল পরিমাণের বিল কৃষিগ্রাহকদের দিতে হয় না। তা সত্ত্বেও হাজার হাজার কৃষক সেখানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যে মাশুল বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০ হাজার কৃষক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। সরকারের বিশ্বায়নের বাণিজ্যিক নীতিকে কার্যকর করার ফলেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে''।

## শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পাটনায় শোভাযাত্রা

শহীদ-এ-আজম ভগৎ সিংয়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে গত ২৮ সেপ্টেম্বর পাটনা জেলা কমিটির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পাটনা শহর পরিক্রমা করে। মিছিল ভগৎ সিং চকে পৌঁছানোর পর সেখানে শহীদের মূর্তিতে মাল্যদান করেন এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সাধনা মিশ্র, এ আই ডি এস ও-র বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড সূর্যকুমার জিতেন্দ্র, এ আই ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে কমরেড অনিলকুমার চাঁদ, ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর কমরেড সন্তোষ কুমার, এ আই এম এস এস-এর কমরেড অনামিকা এবং ডি এস ও-র পাটনা জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ।

**মহারাষ্ট্র**

এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে ২৮ সেপ্টেম্বর শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষের উদ্বোধনী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় নাগপুরের ভুরে ভবনে। এছাড়া ৪ অক্টোবর অযোধ্যানগরের সরকারি ছাত্রাবাসে এবং ১১ অক্টোবর সন্ত গাডগেবাবা কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষ পালিত হয়।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06



# ভুবনেশ্বরে কৃষক ও খেতমজুরদের বিশাল সমাবেশ

অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের ডাকে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ওড়িশার ভুবনেশ্বরে হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুর ১৭ দফা দাবিতে রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেয়। বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ায় কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষকদের বিনামূল্যে সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ, সুদমুক্ত ঋণ, দাবিতে এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এ আই কে কে এম এসের সহসভাপতি এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড রঘুনাথ দাস, জাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড সুরেন্দ্র মল্লিক এবং কমরেড গোবিন্দ মহারানা। পিএমজি স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভায়

বন্যাকবলিত এলাকায় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফি সহ সকল ফি মকুব, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ-রাস্তা-স্কুল অবিলম্বে মেরামত, করমুক্ত ডিজেল ও কেরোসিন সরবরাহ, খেতমজুরদের সারা বছর কাজের বক্তারা কেন্দ্রের সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের এবং রাজ্যের বিজেডি-বিজেপি সরকারের কৃষক স্বার্থ বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

# খড়্গপুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির ডেপুটেশন

১২৮০ একর আবাদি জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে গত ১৬ অক্টোবর খড়্গপুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে শত শত কৃষক ও খেতমজুরের স্বাক্ষরিত গণআপত্তিপত্র নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক সূর্য প্রধানের নেতৃত্বে কমিটির সভাপতি গৌরহরি ঘোষ সহ স্বপন ঘোষ, বিশ্বরঞ্জন মহাপাত্র, জয়শ্রী চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ সাহু মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি ও আপত্তিপত্র জমা দিয়ে হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুরকে সর্বস্বান্ত করার সরকারি পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেন।

কমিটির পক্ষ থেকে শিল্পস্থাপনের জন্য এই মহকুমারই অন্য এলাকায় অনাবাদী ও পতিত জমির সন্ধানও প্রশাসনকে দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে মহকুমা শাসক বিষয়টি তাঁর দপ্তরের আওতাভুক্ত নয় বলে জানান। তবে বিষয়টি নিয়ে এলাকায় মানুষের আপত্তির কথা তিনি প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এদিকে কৃষিজমি কেড়ে নেওয়া রুখতে আন্দোলনকে তাঁরা আরও জোরদার করতে চলেছেন এবং দীপাবলীর পরই জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন খড়্গপুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির নেতৃবৃন্দ।

# পথ-অবরোধে কোচবিহারের চাষীরা

*গত বছর ধসায় ক্ষতিগ্রস্ত বীমাভুক্ত আলুচাষীদের ঋণ মকুবের সরকারি প্রতিশ্রুতি পালনের দাবিতে ২৬ অক্টোবর কোচবিহারের ১নং ব্লকের সাতমাইলে চাষীরা কোচবিহার-মাথাভাঙা সড়ক অবরোধ করে। আলু-পাট-ধান চাষী সংগ্রাম কমিটি আহূত এই অবরোধে পাঁচ শতাধিক চাষী অংশগ্রহণ করে। ডিএমের সাথে আলোচনার জন্য বিডিও আহ্বান জানালে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।*

# সিঙ্গুর ঃ রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা

সিঙ্গুরের কৃষকরা যখন দাঁতে দাঁত দিয়ে জমিরক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁদের আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ালেন রাজ্যের দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও। গত ১৭ অক্টোবর রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে জনবিরোধী এবং উন্নয়নবিরোধী জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে সরকারকে বিরত করার জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেন তাঁরা। এই স্মারকলিপিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিসারি সায়েন্স, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আই আই টি খড়্গপুর, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির মোট ১৩০ জন অধ্যাপক স্বাক্ষর করেন। রাজ্যপালের কাছে তাঁরা ছয়টি বিষয়ে আলোচনার জন্য সময় চেয়েছেন। স্মারকপত্রে তাঁরা উদ্বেগের সাথে বলেছেন, সিঙ্গুরের সেচসেবিত বহু ফসলি জমি অধিগ্রহণ করে সুসংহত কৃষি পরিকাঠামো বিপন্ন করলে খাদ্য সমস্যা দেখা দেবে এবং দারিদ্র্য বাড়বে। প্রস্তাবিত উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন কারখানায় কয়েকশ দক্ষ কারিগরের চাকরির সম্ভাবনা থাকলেও দশ সহস্রাধিক পরিবার কারখানার জন্য জীবিকাচ্যুত হবে। যারা উচ্ছেদ হবে তাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়নি। তাছাড়া যে ক্ষতিপূরণই তাদের দেওয়া হোক না কেন তাদের ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল হতে হবে যেখানে সুদের হার ক্রমাগত কমছে। স্মারকপত্রে আরও বলা হয়েছে, সরকার শিল্পায়নের প্রশ্নে যথার্থই আন্তরিক হলে কৃষি অর্থনীতি বিপন্ন না করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের পতিত জমিতে অথবা বন্ধ কারখানার হাজার হাজার একর জমিতে শিল্প করত। জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে কৃষকদের আন্দোলনে বর্বর পুলিশি আক্রমণে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে সে বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অতিদ্রুত সিঙ্গুর সমস্যা মোকাবিলায় রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তাঁরা।

## জমি রক্ষার লড়াই বাঁকুড়াতেও

# ট্রান্সদামোদর ল্যান্ড লুজার ও ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনশন

কৃষকের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার যত তৎপর, উচ্ছেদ হওয়া মানুষের পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালনে ততই উদাসীন। এই চিত্র দেখা যাচ্ছে বাঁকুড়ার বড়জোড়ার ক্ষেত্রেও। বড়জোড়ার ৯টি মৌজায় ১৬টি গ্রামের মাটির তলায় চারটি কয়লা ব্লক রয়েছে। এক-একটি ব্লকের ওপরের জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মোট ৬৯৭ একর জায়গা অধিগ্রহণের কথা সরকার স্পষ্ট করে বললেও এই তিন/চার ফসলি জমি থেকে যারা উচ্ছেদ হবে, খোলা খাদানের কোলিয়ারির জন্য যাদের ভিটেমাটি ছাড়তে হবে, তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের প্রশ্নে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই। কৃষকরা বহুবার জেলা প্রশাসনের কর্তাদের কাছে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের উদ্বেগের মূল্য দিয়ে প্রশাসন কোন সদর্থক আলোচনা করেনি। এমতাবস্থায় কৃষকরা জমি রক্ষার্থে সংগঠিত হয়েছেন, গড়ে তুলেছেন 'ট্রান্সদামোদর ল্যান্ড লুজার ও ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন'। এই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গত ১৪ অক্টোবর চুনপোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহস্রাধিক কৃষক এক প্রকাশ্য কনভেনশনে সমবেত হন। উপযুক্ত মূল্য, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত পুনর্বাসন এবং চাকরির প্রতিশ্রুতি না মেলায় এই কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কনভেনশনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন জেলা ও ব্লক স্তরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। কনভেনশনে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে প্রতিটি পাড়ায় কৃষক, মহিলা, যুবক, ছাত্রদের নিয়ে গণকমিটি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই কনভেনশনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সিঙ্গুরের কৃষক সংগ্রামের অন্যতম নেতা কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য। সিঙ্গুরে সিপিএম ও পুলিশের বর্বর আক্রমণ সত্ত্বেও চাষীরা যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তিনি তার উল্লেখ করেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন জয়ন্ত পবি। সামগ্রিকভাবে সভা পরিচালনা করেন সম্পাদক অশোক ব্যানার্জী। প্রস্তাব পাঠ করেন অশোক পান। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। এই কনভেনশন সিঙ্গুরের কৃষকদের আন্দোলনকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানায়।

# জাজপুরে মহিলা সম্মেলন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে গত ৬ সেপ্টেম্বর ওড়িশার জাজপুর জেলার রসুলপুর ব্লকে মহিলাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে দুই শতাধিক মহিলা যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জাজপুর জেলা সম্পাদিকা কমরেড আদরমণি বরাল। সভায় মূল বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জাজপুর জেলা সভানেত্রী কমরেড শান্তিলতা পণ্ডা। এস ইউ সি আই রসুলপুর ব্লক কমিটির সম্পাদক কমরেড গতিকৃষ্ণ দাস প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে পণপ্রথা, মহিলাদের উপর অত্যাচার, অশ্লীলতা, মদ ও নানা মাদক দ্রব্যের প্রসার প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সম্মেলনে প্রতিনিধিরা এইসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা প্রতিরোধে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পতাকাতলে ব্যাপকভাবে মহিলাদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সম্মেলন থেকে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রসুলপুর ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। কমরেড হেমলতা মল্লিক সভানেত্রী ও কমরেড ঝর্ণা সাহু সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। এলাকায় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া লক্ষ করা যায়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in